পৃথিবী-পরিচয়

সুধাংশু পাত্র

বাণীশিল্প কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৬২

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

আমার প্রকাশক বন্ধুকে

পৃথিবী-পরিচয়

মহাকাশে পৃথিবীর স্থান

অনন্ত মহাশূন্যে অনন্ত রূপের পসরা বহন করে কোটি কোটি বছর একই ছন্দে এবং একই গতিতে সূর্য-পরিক্রমা করে চলেছে আমাদের এই মাটির পৃথিবী। সৌরজগতে তো বটেই, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও পৃথিবীর তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রায় এক হাজার কোটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সী নিয়ে গঠিত। তাঁদের আরও বিশ্বাস, এক একটি নক্ষত্র-জগতে খুব কম করেও আছে হাজার কোটি নক্ষত্র। যন্ত্রের সাহায্যে অনেক অনুসন্ধান করেও মহাকাশের বাসিন্দা সহস্র সহস্র সূর্যের কারও কোন গ্রহজগৎ তাঁরা আজও আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। তবুও বিজ্ঞানীদের অনুমান, মহাকাশে আপন আপন কক্ষপথে সতত পরিক্রমারত কোটি কোটি নক্ষত্রদের কারও কারও গ্রহজগৎ থাকা একেবারে অসম্ভব নয়; হয়ত এক একটি নক্ষত্র জগতে মাত্র দু-একটি নক্ষত্রই এমন দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। বাদবাকি সবাই একক, যুগল, অথবা দুয়ের অধিক নক্ষত্রের এক একটি পুঞ্জ।

বিজ্ঞানীরা আবার অনুমানকে বড় একটা প্রশ্রয় দেন না। তথাপি এ ক্ষেত্রে একমাত্র অনুমান ছাড়া দ্বিতীয় কোন অবলম্বন তাঁরা আজও খুঁজে পাননি। বিজ্ঞানীরা অনেক রকমের দূরবীন আবিষ্কার করেছেন সত্য, কিন্তু সেই সব দুরবীনের দৃষ্টিসীমা আমাদের সৌরজগৎ ছেড়ে খুব বেশিদূরে অগ্রসর হতে পারছে না। মাত্র কয়েকটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সীর আবছায়া প্রতিমূর্তি তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। অন্যদিকে পৃথিবী থেকে বেতারতরঙ্গ পাঠিয়েও সুবিধাজনক ও বিশেষ কোন তথ্য লাভ করতে পারা যায় নি। তাই এক কথায় বলা যেতে পারে, মহাকাশের খবর সংগ্রহের ব্যাপারে আজও অতিক্রান্ত হয়নি আমাদের প্রাথমিক অবস্থা। তাহলে মানুষ কেমন করে ভেদ করবে সীমাহীন মহাবিশ্বের অনন্ত রহস্য!

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নক্ষত্রজগৎ—এসব তো দূরের কথা শত শত বছরের সাধনায় মানুষ আজও পর্যন্ত আমাদেরই সৌর জগতের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। সংগ্রহ করতে পারেনি সূর্যের অপরাপর গ্রহের সঠিক পরিচয়। এমন কি সূর্যের দশম গ্রহ সম্বন্ধেও আছে যথেষ্ট সংশয়। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থানকারী জ্যোতিষ্কদের খবর সংগ্রহ করা কী মুখের কথা ?

বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একটা হতাশার বাণীও শুনিয়েছেন। তাঁদের মতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন অকল্পনীয় মহাবিশ্বের সমূহ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা তার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। কারণ হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেছেন, পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কোন নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগতের অপসরণ বেগ আলোকের গতিবেগের সমান। (এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের মতে ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে। তার ফলে যে সমস্ত নক্ষত্র-জগৎ নিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত, সেই সব নক্ষত্রজগতের পারস্পরিক ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তাদের পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির গতিবেগকে বলা হয় অপসরণ বেগ।) মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ যদি ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশি হয় তবে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ অপেক্ষা দূরের নক্ষত্রগুলির অপসরণ বেগ আলোকের গতিবেগের চাইতে ঢের বেশিই হবে। কিন্তু মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, কোন কিছুর গতিবেগ আলোর গতিবেগ অপেক্ষা অধিক হতে পারে না। অতএব বলা যেতে পারে, মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ ও অপসরণ বেগ সম্পর্কে আমাদের ধারণায় ত্রুটি আছে অথবা ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক না কেন তার দৃষ্টিসীমা ঐ ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বিজ্ঞানী হয়েলের মতে আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতি দূর কোন প্রান্তদেশে হয়ত এমন এক কোন সীমারেখা আছে যার ওপারে কাল (টাইম) ঋণাত্মক হয়ে যায়, আলোক যে সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায়। তা যদি সত্য হয় তাহলে পার্থিব বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর আর প্রযোজ্য নয়। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাস যে কত কোটি আলোকবর্ষ তাও যেমন নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না অপরদিকে তেমনই মহাবিশ্বের দরবারে পৃথিবীর অবস্থান যে কোথায় কোন প্রদেশে সে কথাও কোন কালে মানুষ বুঝতে পারবে কিনা—সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মহাবিশ্বের আঙিনায় পৃথিবী যেটুকু স্থান অধিকার করে আছে তার পরিমাণ যে অতি নগণ্য—সে কথা সকলেই জানে। মহাকাশের বুকে পৃথিবী যেন

মহাসাগরের ললাটে একবিন্দু শিশির। অনেকের আবার এই উপমাটা মনঃপূত নাও হতে পারে। তাঁরা বলবেন, মহাবিশ্বকে যদি মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে পৃথিবীটা হবে তার বুকে অতি ক্ষুদ্র একটি জীবাণু—যাকে খালি চোখে দেখা তো দূরের কথা, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ধরা যাবে না।

কিন্তু মহাবিশ্বের দরবারে পৃথিবীর স্থান নিতান্ত তুচ্ছ হলেও তার বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, তার অঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব ও উদ্ভিদ-জগৎ। ঐ একটি কারণেই তার রূপ সীমাহীন এবং সে সতত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য একত্রিত হয়ে গড়ে উঠেছে এই পৃথিবী। যে পরিক্রমা করছে তার জন্মদাতা সূর্যের চারদিক। তাকে আরও সুন্দর, আরও মহৎ করেছে তার প্রিয় সন্তান মানুষ। যদিও জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারায় সর্বশেষে এসেছে সে। মানুষ এরই মধ্যে জেনে নিয়েছে পৃথিবীর অতীতের সুখদুঃখের ইতিহাস। সেই সঙ্গে জেনে নিয়েছে কোন্ গুণে এবং জন্মমুহূর্তে কোন্ কোন্ পরিবেশ লাভ করার জন্য পৃথিবী, উপাদান ও সংশ্লেষণ উভয় দিক থেকে, এমন মূল্যবান।

প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাকাশে পৃথিবীর মত গ্রহের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। মহাকাশের বড় বড় বাসিন্দাদের মধ্যে সূর্যের সংখ্যাই অধিক। বিশ্ব-গ্রাসী তাদের ক্ষুধা। জানা গেছে, তাদের সেই অনন্ত ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করার জন্য প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি টন হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হয়। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করছে হিলিয়ামকে। সেই সঙ্গে বিতরণ করছে প্রচণ্ড তেজ। আমাদের সূর্যের অভ্যন্তর প্রদেশের তাপমাত্রা ২ কোটি ডিগ্রি কেলভিনেরও বেশি, বহির্তলে তা ৫৭৫০ ডিগ্রি কেলভিনের মতো। ১ কোটি বা ১ কোটি ২০ লক্ষ ডিগ্রি কেলভিনের উর্দ্ধে প্রতি চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ২৭৩ ডিগ্রি কেলভিন=০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সূর্যরা তাই এক একটি সুবিশাল গ্যাসীয় অগ্নিময় গোলক। অহরহ লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত অগ্নিশিখাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে মহাকাশের বুকে। কিন্তু যত শক্তি নিয়েই প্রজ্জ্বলিত হোক না কেন, মহাকাশের মহানিশার কাছে তাঁদের দীপ্তি জোনাকির মত নিষ্প্রভ। বলদর্পী সূর্যরা ঐ প্রজ্জ্বলিত হওয়া ছাড়া অপর কোন বৈশিষ্ট্য রাখতে পারেনি। কেবল যে সব ভাগ্যবান সূর্যের গ্রহজগৎ আছে তারাই রেখেছে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর।

অপরদিকে যে সমস্ত সূর্যের গ্রহজগৎ আছে তাদের সবাই যে পৃথিবীর মত গ্রহের জন্মদান করেছে এমনও নয়। অধিক সংখ্যক গ্রহের মালিকদের কেউ কেউ হয়ত এমন দুর্লভ গ্রহ লাভ করেছে একটি অথবা দুটি। আমাদের সূর্যের কথাই ধরা যেতে পারে। ন'টি অথবা দশটি গ্রহের মালিক সে। প্রথম গ্রহ বুধ সূর্য-সন্নিকটে থাকার জন্য প্রচণ্ড তার দেহের তাপমাত্রা। আবহমণ্ডল নেই। অতি ক্ষীণ তার আকর্ষণ বল। তাই বুধ-পৃষ্ঠ এক উষর মরুক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিতীয় গ্রহ শুক্র পৃথিবীর মত মাঝারি ধরনের গ্রহ হলেও প্রচণ্ড তার আকর্ষণ বল। ভয়ঙ্কর তার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা। তাকে আবার ঘিরে রেখেছে সুগভীর এক মহাজাগতিক ধূলির আবরণ। অত্যন্ত ভারী তার আবহমণ্ডল এবং সব সময় সেখানে উত্থিত হচ্ছে ধূলির ঝড়। উক্ত কারণগুলির জন্য শুক্রদেহও উন্নত জীবগোষ্ঠীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পৃথিবীর পরবর্তী গ্রহ মঙ্গল আয়তনে ক্ষুদ্র বলে আকর্ষণবল নিতান্তই কম এবং ভাল আবহমণ্ডল নেই। অতএব পৃথিবীর মত উন্নত জীব সেখানেও বাস করছে না।

বৃহস্পতি ও শনি আকারে সুবৃহৎ। একা বৃহস্পতির গহ্বরে তেরশ' পৃথিবী স্থান পেতে পারে। কিন্তু হালকা বস্তুরাশি দিয়ে গড়া ওদের শরীর, অতি উত্তপ্ত অভ্যন্তর ও শীতল বহির্দেহ এবং প্রবল আকর্ষণ বল। সূর্যের সুদূরতম গ্রহগুলি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, আরও-আরও শীতল এবং আরও হালকা পদার্থ দিয়ে গঠিত। তাই সবারই পৃষ্ঠদেশ উন্নত জীব বাসের অনুপযোগী। বৃহস্পতি ও শনি কিছুটা সূর্যের আলো লাভ করলেও পৃথিবীর মত আলোর বন্যা ওদের প্লাবিত করে না। আর দূরের গ্রহগুলি অন্ধকারে প্রেতের মত নিঃশব্দ পদচারণায় পরিক্রমা করছে সূর্যকে। হয়ত পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহের কোন কোনটিতে জীব আছে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর উদ্ভিদও আছে। এমনও হতে পারে, কেউ কেউ পৃথিবীর মত কারবন-ভিত্তিক জীব ও উদ্ভিদ লাভ করতে না পারলেও বোরণ কিংবা সিলিকন-ভিত্তিক জীব ও উদ্ভিদ লাভ করেছে। তথাপি পৃথিবীর মত ভাগ্য কারও হয়নি। কেউ লাভ করতে পারেনি পৃথিবীর মত উন্নত জীব ও উদ্ভিদমণ্ডলকে।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীর এমন কোন্ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে —যার জন্য এমন অপরূপ তার দেহখানা? বিশেষ করে শুধু পৃথিবীতে নয়, আন্তর্স্টেলীয় প্রদেশের আরও বহু জায়গায় যখন তেরোটি প্রধান জৈব অণু— HCN, HCHO, H_2CS, CHOOH, NH_2CN, NH_2HCO, HC_3N, HNCO, CH_3CN, CH_3OH, CH_3C_2H, CH_3NH_2, CH_3CHO—

উপস্থিত ? তার উত্তরে শুধু এইটুকুই বলা যায়, পৃথিবীর পরিবেশই পৃথিবীকে করেছে ঐশ্বর্যশালিনী। এই পরিবেশ আবার তার অর্জিত নয়। দৈবক্রমে লাভ করেছিল বলেই সূর্যের গ্রহদের মধ্যে সে একটি ব্যতিক্রম।

পার্থিব পরিবেশগুলির মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় পৃথিবীর আবহমণ্ডলের। এই আবহমণ্ডলেই আছে জীব ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের উপাদান। জীবনের মূল উৎস ঐ আবহমণ্ডল যা মহাকাশের সহস্র বিপদের রক্ষাকবচ। আবহ-মণ্ডলের সমান গুরুত্বপূর্ণ সূর্যের আলো। সূর্য থেকে একটা বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করার জন্য খুব বেশি তাপে পৃথিবী ঝলসে যাচ্ছে না অথবা ঠাণ্ডায়ও জমে যাচ্ছে না। পৃথিবীর মাটি, পৃথিবীর জল, পৃথিবীর আকর্ষণবল, সব কিছুর প্রভাবেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বর্তমান রূপটি। বলাবাহুল্য এদের কোন একটির অভাব ঘটলে পৃথিবীর রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটতো। মানুষের মত জীব কোনদিন আসতে পারতো কিনা সন্দেহ।

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ ও উক্ত পরিবেশে জৈব-ক্রমবিবর্তন যখন পৃথিবীকে এনে দিয়েছে জীব ও উদ্ভিদ তখন নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহাকাশে কোন সূর্যের কোন গ্রহ যদি উক্ত পরিবেশ লাভ করে তাহলে সেও অনুরূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে লাভ করেছে পৃথিবীর মত উন্নত জীবগোষ্ঠী। তবে বলা যেতে পারে, মহাকাশের দরবারে দুর্লভ আমাদের সূর্যের মত জ্যোতিষ্ক এবং সুদুর্লভ পৃথিবীর মত গ্রহ। তথাপি পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, অনন্ত মহাকাশে —যেখানে সহস্র সহস্র কোটি নক্ষত্রজগৎ বিদ্যমান, সেখানে অবশ্যই কোন কোন সূর্যের গ্রহজগৎ আছে। আর পৃথিবীর মত গ্রহের সংখ্যাও কম করে কয়েক কোটিই হবে।

বিজ্ঞানীরা বড় আশাবাদী। তাঁরা এমনও মনে করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কোন গ্রহ থাকতে পারে যাদের বুকে জীব ও উদ্ভিদ পৃথিবীর মত কারবন ভিত্তিক নয়। আবার অনেকে এমন সিদ্ধান্তেও এসেছেন, পৃথিবী যে সব বস্তু কণা দিয়ে গঠিত তার বিপরীত বস্তুকণা বা অ্যান্টিম্যাটার দিয়ে গঠিত গ্রহও মহাবিশ্বে থাকতে পারে। বলা বাহুল্য, বিপরীত বস্তুকণার দ্বারা গঠিত গ্রহে যদি জীব ও উদ্ভিদ থাকে তাহলে তাদেরও গঠন উপাদান হবে ঐ বিপরীত বস্তুকণা এবং সেই জীবের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সবই হবে পৃথিবীর জীবের বিপ্রতীপ।

আমাদের পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদদেহের একটি প্রধান উপাদান কারবন বা কয়লা। তাই এখানকার জীব ও উদ্ভিদ কারবন-ভিত্তিক। পৃথিবীর বস্তুকণার

প্রধান উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। বিপরীত বস্তুকণা তথা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের বিপরীতধর্মী কণিকা পজিট্রন, অ্যান্টিপ্রোটন ও অ্যান্টিনিউট্রনও পার্থিব বস্তুর পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে। তবে তাদের পরিমাণ অতি সামান্য এবং এগুলি নিউক্লিয়াসে সাম্যাবস্থায় থাকে। পারমাণবিক গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত কয়েকটি বিরল পদার্থ বাদ দিলে পৃথিবীর মাটি, বায়ু, জল প্রভৃতির উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে নব্বইটি পার্থিব মৌলিক উপাদান পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেকের পরমাণুতে থাকে ঐ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। অতএব পৃথিবীর বস্তুরাশির সূক্ষ্মতম উপাদান ঐ তিনটিই। একদিন মহাকাশে যে বিশালকায় গ্যাসীয় মেঘ থেকে সূর্যের উৎপত্তি হয়েছিল, সেই মেঘেরই প্রাথমিক উপাদান ছিল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনরা। এগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে কালক্রমে সৃষ্টি করেছিল নানা মৌলিক পদার্থের পরমাণু। মৌলিক পদার্থ থেকে পরিশেষে উৎপন্ন হয় যৌগিক পদার্থ। তাই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর মধ্যেই আছে উক্ত উপাদানগুলি। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখব আনুমানিক ২০০০ কোটি বর্ষ আগে সৃষ্টি হওয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আনুমানিক ৬৬০ কোটি বর্ষ আগে 'জন্ম শুরু হওয়া' সূর্যের সৌরমণ্ডল, বিভিন্ন গ্রহ ও বিশেষ করে পৃথিবীর উৎপত্তি হল কী করে, যে উৎপত্তিকাল আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বর্ষ আগের সময় বলে অনুমিত।

পৃথিবীর উৎপত্তি

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এ যাবৎ যতগুলি মতবাদ প্রচারিত হয়েছে তাদের সবগুলিই মূলত তাত্ত্বিক। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক অনুমান ছাড়া বিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় কোন অস্ত্র নেই। সেই কোন বিস্মৃত অতীতে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। শত শত কোটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার বুকে এসেছে জীব। জীবের ক্রমবিবর্তনও চলেছিল দু'শ' কোটি বছরেরও অধিককাল। সর্বশেষে এসেছে মানুষ। সেই মানুষকে আবার আরণ্যক জীবনে পড়ে থাকতে হয়েছে কত সহস্র বছর। তারপরে যখন তাদের জীবনে নিরাপত্তা আসে, অরণ্য কেটে নগর পত্তন করে তখনই তাদের মনে স্থান পায় সুস্থ বিজ্ঞানচিন্তা। আজকের দিনে বিজ্ঞানের যে জয়গান আমরা শুনতে পাই—সে তো মাত্র কয়েকশো বছরের মানুষের সাধনার ফল। অতএব সেই সুদূর অতীতের কথা মানুষ জানবে

কেমন করে? তাছাড়া সে এ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেনি—যার দ্বারা কোটি কোটি বছর আগেকার ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। অপরদিকে যে সব দুরবীন আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের দ্বারা বছরের পর বছর মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেও একটি গ্রহ কিংবা একটি নক্ষত্রের জন্ম মুহূর্ত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। যদিও তাঁরা বলেন, মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টির কাজ আজও অব্যাহত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করে কীভাবে নক্ষত্ররা যে আত্মপ্রকাশ করে, তা তাঁদের যন্ত্র বলে দিতে পারে না। তাই বলা যেতে পারে কেবল পৃথিবী নয়, মহাকাশের প্রতিটি বাসিন্দার জন্মকথা মানুষের কাছে আজও রহস্যাবৃত।

রহস্য উদঘাটন করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে মানুষের মনে। যেখানে আছে রহস্য, সেইখানেই আছে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়। আর সেই দিকেই মানুষের মন ছুটে যায় সর্বাগ্রে। তাই তো দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে মানুষ সচেষ্ট হয়েছে পৃথিবীর জন্মরহস্য উদঘাটন করতে। প্রাচীনকালে—যেদিন মানুষের হাতের কাছে বিজ্ঞানের এত সরঞ্জাম জমা হয়নি, সেদিন তারা প্রাধান্য দান করেছিল একমাত্র কল্পনাকে। কত দেশের কত চিন্তাশীল ব্যক্তি কত যে কল্পনা করেছিলেন তার হদিস আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সবাই ধরে নিয়েছিলেন, বিশ্বনিয়ামক এক অকল্পনীয় মহাশক্তি, তাঁদের কল্পনার মূলে কোন যুক্তি ছিল না। কোন তত্ত্বেরও তাঁরা অবতারণা করেননি। কেবল অসম্ভব অসম্ভব কাহিনী রচনা করে এবং সমস্ত কাহিনীকে স্রষ্টার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আজকের মানুষও কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু যুক্তিহীন কল্পনায় সে আর আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। প্রত্যেকটি কল্পনার পেছনে একটা যুক্তিকে খাড়া করতে চায়। যাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করা যায় না, যাঁদের যুক্তির সমর্থনে বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় এবং একাধিক যুক্তি ও তত্ত্বের অবতারণা করতে হয় তাঁরাই বিজ্ঞানী। তাই আজকের কল্পনাকে নিছক কল্পনা বলা চলে না। বলা যেতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমান।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জন্মসংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অনুমান খাড়া করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু তাঁদের সমস্ত অনুমানকে বিজ্ঞান গ্রহণ করতে পারেনি। আবার কিছু কিছু মতবাদকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করলেও পরে পরিত্যাগ করেছে। কারণ, সেই অনুমান তথা মতবাদকে বিজ্ঞান গ্রহণ করতে পারে—যার দ্বারা অধিকাংশ প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব। কিন্তু এ যাবৎ যতগুলি

মতবাদের অবতারণা করা হয়েছে, তাদের কোন একটির আশ্রয় গ্রহণ করে সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। কেবলমাত্র দুটি মতবাদকে একত্রিত করলে কিছু কিছু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা তাই এখন সেই দুটি মতবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছেন।

পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে ১৭৯৬য়ে ল্যাপল্যাসের অনুমানের পর আবার বিজ্ঞান-সম্মত একটি মতবাদের অবতারণা করেছিলেন স্যার জেমস্ জীন্স্ ও হ্যারল্ড জেফ্রিস। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই মতবাদটির নাম দেওয়া হয়েছে "জীন্সের মতবাদ"। এই মতে, কোন এক সুদূর অতীতে আমাদের সূর্য অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে বৃহত্তর একটি ভ্রাম্যমান নক্ষত্র মহাকাশ পরিক্রমা করতে করতে একবার সূর্যের সমীপবর্তী হয়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে যখন তা সূর্যকে অতিক্রম করে গেল তখন তার বিরাট আকর্ষণবল ছিন্ন করে নিয়ে গেল সূর্যদেহের একটি বড় অংশকে। কিন্তু বিছিন্ন অংশটিকে সে সঙ্গে করে নিতে পারল না। সেটি সূর্যের আকর্ষণের আওতায় থেকে গেল এবং সূর্যকেই পরিক্রমা করতে আরম্ভ করল। সূর্যদেহ থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তখন সেটি ছিল গ্যাসীয় অগ্নিময় পিণ্ড। কালক্রমে শীতল হয়ে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

এককালে জীন্স্-এর মতবাদকে পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হতে দেখা গেল মতবাদটির মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। প্রথমত, বিশ্বজগৎ নিয়মে বাঁধা। নক্ষত্র যত বড় এবং যত স্বেচ্ছাচারী হোক না কেন হুট করে সূর্যের কাছে ছুটে আসবে, আবার যেখানে খুশি ছুটে যাবে—তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। গ্রহ উপগ্রহদের মত নক্ষত্রকেও একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে কোন না কোন গ্যালাক্সীর চারদিকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ শীতল হয়ে যদি সমস্ত গ্রহ উপগ্রহদের জন্মদান করত তাহলে সব গ্রহ উপগ্রহদের গঠন উপাদান একই হ'ত। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, কয়েকটি গ্রহাণু এবং পৃথিবী ও মঙ্গলের উপগ্রহগুলিতে লৌহশিলার ও অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থের প্রাচুর্য। অবশিষ্ট গ্রহাণু, বৃহস্পতি, শনি এবং তাদের উপগ্রহগুলিতে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম তেল ও জমাট জলের প্রাধান্য। সূর্যের সুদূরতম গ্রহগুলি অর্থাৎ ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো এবং ওদের বিভিন্ন উপগ্রহে নিয়ন ও মিথেন গ্যাসেরও ছড়াছড়ি।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, সূর্যদেহে পার্থিব বস্তুর পরিমাণ অতি সামান্য। শতকরা মাত্র একভাগের মত আছে পার্থিব উপাদান। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন, গ্রহ-উপগ্রহরা যদি সূর্যদেহের বিচ্ছিন্ন অংশ হ'ত তাহলে সূর্যদেহের উপাদানের সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহদের উপাদানের কিছুটা মিল থাকতোই। অপরদিকে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের উপাদানের মধ্যে কোন বিপুল পার্থক্য থাকতো না। তাছাড়াও এই মতবাদ যদি সত্য হত, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছেন, তবে পৃথিবীতে আজ মোট যে পরিমাণ জল আছে তার শতকরা দশ ভাগের বেশি থাকতো না। সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে অধিকাংশ জল বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেত। তাই অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞানীরা পরিত্যাগ করেছেন "স্যার জেমস্ জীন্স্"-এর মতবাদটিকে।

জীন্সের পর পৃথিবী তথা গ্রহদের জন্মসংক্রান্ত যে সব মতবাদ প্রচারিত হয়েছে তাদের মধ্যে দুটি মতবাদই প্রধান। দুটি মতবাদের একটিকে প্রচার করেছেন প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন উইৎসেকার (এবং কুইপার ও য়ুরে) এবং অপরটির প্রবক্তা অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল। মতবাদ দুটির নামকরণ করা হয়েছে যথাক্রমে "উল্কা মতবাদ" এবং "বলয় মতবাদ"। দুটি মতবাদই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রহদের জন্ম-সম্বন্ধীয় সমূহ প্রশ্নের মীমাংসা করা উপরোক্ত দুটি মতবাদের যে কোন একটির দ্বারা সম্ভব হয়নি। দুটি মতবাদের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে বর্তমানে গ্রহদের জন্ম-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। উইৎসেকারের উল্কা মতবাদের প্রথম অংশ এবং হয়েলের বলয় মতবাদের দ্বিতীয় অংশই স্বীকৃতি পেয়েছে এবং যতদিন পর্যন্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কোন মতবাদ প্রচারিত না হচ্ছে ততদিন এই দুই মতবাদকে প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রথমে উল্কা মতবাদের কথা উল্লেখ করা হ'ল। মতবাদটি প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই মতে, যে সুবৃহৎ গ্যাস ও ধূলির থালা থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছিল তার বাহিরে ও অবশেষ রূপে ছিল লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ধূলি ও গ্যাসের ঘনীভূত মেঘপুঞ্জ। সেগুলি ছিটকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারল না। সূর্যের প্রবল আকর্ষণবল তাদের বন্দী করল। ধূলিকণা এবং গ্যাসকণাকে তখন বাধ্য হয়ে আপন আপন বৃত্তাভাস পথে পরিক্রমা করতে হ'ল সূর্যকে। তাদের সংখ্যা ছিল অকল্পনীয় এবং সূর্য পরিক্রমার পথও ছিল অগণিত। সমতলে ছিল না কারও কক্ষপথ। তাই অধিকাংশের পথ একে অপরকে ছেদ করেছিল। তারই ফলে ধূলিকণা ও গ্যাসকণার মধ্যে অহরহ সংঘর্ষ হতে থাকে এবং ছোট

ছোট কণা একে অপরের গায়ে আটকে ধীরে ধীরে বড় হতে আরম্ভ করে। যাদের শরীর বেশ কিছু বড় হয়ে উঠল তাদের মধ্যে প্রকাশ পেল মাধ্যাকর্ষণ বল। আর তখনই আশে পাশের ছোট ছোট বস্তুপিণ্ড এবং ধূলিকণাকে আত্মসাৎ করে তারা আপন কলেবরকে বাড়িয়ে নিল এবং একই সঙ্গে একে অন্যের কক্ষপথের ওপর মাধ্যাকর্ষণ বল বিস্তার করে গতিপথ ও গতিবেগের সম্ভবত কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাল। এইভাবে একসময় তাদের শরীর এত বেড়ে উঠল যে, লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত প্রযুক্ত হল তার শোষণ ক্ষমতা। অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠল শরীর এবং বন্দী করল আপন আপন শক্তি ও পরিবেশ অনুযায়ী ভারী অথবা হালকা আবহমণ্ডলকে। পৃথিবীর আকর্ষণে আকাশের উল্কারা যেমন প্রবলবেগে নেমে আসে ঠিক সেইভাবে আদিম বস্তুকণা একে অপরের দেহে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় কয়েকটি গ্রহ সৃষ্টি করেছিল বলে উইৎসেকারের এই মতবাদকে বলা হয় উল্কা মতবাদ।

উল্কা মতবাদের মধ্যেও কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় ফ্রেড হয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞানী বলয় মতবাদের পরিকল্পনা করেন। এই বলয় মতবাদই সর্বাধুনিক মতবাদ এবং অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যে ত্রুটিগুলির জন্য বিজ্ঞানীরা উল্কা মতবাদকে পরিবর্তিত করেছেন, সেই ত্রুটিগুলির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

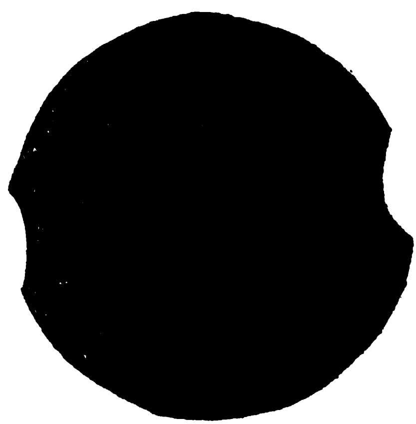
প্রথমত বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন আসে, ছোট ছোট বস্তুপিণ্ড একত্রিত হয়ে এক-একটি বৃহৎ গ্রহের সৃষ্টি করল অথচ দ্রুত আবর্তন সত্ত্বেও তারা পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল না কেন? দ্বিতীয়ত সূর্যের আবর্তন বেগকে কেমন করে গ্রহরা এত মন্থর করল।

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা সূর্যের ভর নির্ণয় করে দেখলেন, সূর্যের যা ভর তাতে তার আবর্তন বেগ হওয়া উচিত মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা অথচ সূর্য তার নিরক্ষরেখায় সাতাশ দিনে মাত্র একবার পাক খাচ্ছে তার মেরুদণ্ডের উপর (মেরুপ্রদেশে একত্রিশ দিনে একবার)। সূর্যের আবর্তন বেগ এত মন্থর হওয়ার একমাত্র কারণ তার গ্রহমণ্ডলী। কিন্তু সেই আদিতে যদি উল্কা মতবাদ অনুযায়ী গ্রহরা উৎপন্ন হয়েছিল তাহলে তখন তার যে আবর্তন বেগ ছিল (বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রথম প্রথম সূর্যের আবর্তন বেগ এই রকমই ছিল) বর্তমানেও থাকতো সেই বেগ। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সমগ্র সৌরমণ্ডলের ভরের শতকরা ৯৯·৯ ভাগ ভর একা সূর্যের, কিন্তু তার কৌণিক ভরবেগ সৌরমণ্ডলের কৌণিক ভরবেগের মাত্র

শতকরা ১·০ ভাগ। অতি সামান্য ভর নিয়েও বৃহস্পতি শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ কৌণিক ভরবেগের অধিকারী।

তৃতীয়ত উল্কা মতবাদকে গুরুত্ব দিলে ধরে নিতে হয় সব ক'টি গ্রহ একই উপাদান নিয়ে গঠিত। কিন্তু গ্রহগুলির উপাদান যে এক নয় সেকথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

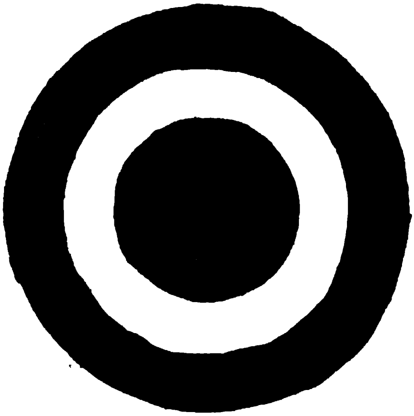
উপরোক্ত ত্রুটিগুলির জন্যই বলয় মতবাদের কল্পনা। এই মতবাদও স্বীকার করে সুবিশাল এক গ্যাসীয় স্তূপ থেকে সূর্যের জন্ম। প্রাথমিক অবস্থায় গ্যাসকণাগুলি অবস্থান করছিল অত্যন্ত বিরলভাবে। তখন গ্যাসীয় স্তূপটির ব্যাস ছিল কয়েক লক্ষ কোটি মাইল। দীর্ঘকাল পরে আভ্যন্তরীণ কোনও এক অস্থিরতার ফলে স্তূপটি আবর্তন করতে আরম্ভ করে। আবর্তন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল সঙ্কোচন। তারপর কেটে যায় সহস্র সহস্র বছর। সঙ্কোচনের মাত্রা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল এবং তার প্রত্যক্ষ ফল হ'ল ঘনত্ব ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি। পরিশেষে আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা আরও বেড়ে উঠল, আবর্তন বেগ হল তীব্র এবং সঙ্কোচনের মাত্রা এমন ভাবে বেড়ে চলল যে স্তূপটি বর্তুলাকার প্রাপ্ত হল। অবশেষে আবর্তন বেগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল। পাম্প দেওয়া বেলুনের দুপাশে জোরে চাপ দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনই আদিম সূর্যের মেরুদ্বয় চেপে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং মধ্যস্থল স্ফীত হয়ে উঠল। এই অবস্থায় সূর্যের কেটে যায় আরও কিছুকাল। তারপর মধ্যস্থল এত স্ফীত হয়ে উঠল যে, সূর্য তাকে আর ধরে রাখতে পারল না। একসময় তা বলয় আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সূর্যের চারদিকে।



আদিম সূর্য

প্রাথমিক অবস্থায় বলয়টি কিন্তু সূর্যের আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবর্তন করছিল। পরের দিকে আর সম্ভব হ'ল না। অপরদিকে পিঠের উপর বিশাল আয়তনের এক বলয়কে বেঁধে সূর্যও পারল না তার আবর্তন বেগকে বজায় রাখতে। যেন হোঁচট খেতে লাগল বার বার। অর্থাৎ কমাতে

বাধ্য হল তার আবর্তন বেগকে। মালগাড়ীতে গণ্ডার পর গণ্ডা মাল বোঝাই বগিকে জুড়লে যেমন অবস্থা হয় এও যেন অনেকটা তেমনই। এই অবস্থায় বলয়টির বেশ সুবিধে হল! সূর্যের আকর্ষণবলকে একটু একটু করে ছিন্ন করে দূর থেকে দূরান্তরে যাত্রা করল।



সূর্য কর্তৃক বিচ্ছিন্ন বলয়

প্রথম প্রথম বলয়টি ছিল অতি উত্তপ্ত। বলয়স্থিত গ্যাসে একদিকে যেমন ছিল হাই-ড্রোজেন, হিলিয়াম, কারবন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ, অপরদিকে তেমনই ছিল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কারবন ডাই অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প, মিথেন প্রভৃতি কতকগুলি যৌগিক পদার্থ। আর গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল নানাপ্রকার ধাতু, ধাতব অক্সাইড ও ধাতব সিলিকেট। মোটামুটি সে সময়ে বলয়ে সব পদার্থ ই ছিল গ্যাসের আকারে।

এবার সূর্য থেকে বলয় যত দূরে সরে গেল ততই হারাতে লাগল তাপ। একসময় যেসব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ খুব বেশি তাপমাত্রায়ও কঠিন অথবা তরল অবস্থায় থাকে তারাই প্রথম ছোট ছোট কণার আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বলয় থেকে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কণাগুলি স্থাণুর মত মহাকাশে এক জায়গায় ভেসে থাকতে পারল না। মহাকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিক্রমা করতে আরম্ভ করল। পরিশেষে উল্কা মতবাদ অনুযায়ী ছোট ছোট কণাগুলি একত্রিত হয়ে গঠন করে গ্রহ উপগ্রহাদি।

বলয়ে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের ও নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের বহু পদার্থ কণা ছিল। বলয়টি যতই দূরে সরে গেল ততই শীতল থেকে শীতলতর হল এবং বস্তুকণা ছড়াতে ছড়াতে অগ্রসর হল। ক্রমে অত্যধিক ঠাণ্ডায় নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের পদার্থগুলোও ঘনীভূত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। বলয়টি শ' শ' কোটি মাইল দূর পর্যন্ত গিয়েছিল বস্তুকণা পরিত্যাগ করতে করতে। অবশেষে যে গ্যাসগুলি ঘনীভূত হতে পারল না—সেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামকে নিয়ে বলয় মহাশূন্যে মিশে গেল।

সূর্যের নিকটস্থ অঞ্চলে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের বস্তুকণা যথা লোহা ও অন্যান্য ধাতু; নানা ধাতব অক্সাইড এবং সিলিকেট ইত্যাদি ঘনীভূত হয়েছিল। কালক্রমে সেই বস্তুকণাগুলি একত্রিত হয়ে জন্মদান করে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, পৃথিবী ও মঙ্গলের উপগ্রহ এবং কয়েকটি গ্রহাণুকে। সূর্যের কাছ থেকে চল্লিশ কোটি মাইল দূর পর্যন্ত বলয় ছড়িয়ে দিয়ে গেছিল প্রধানত লৌহশিলা। তাই এই অঞ্চলটাকে বিজ্ঞানীরা লৌহশিলা অঞ্চল নামে অভিহিত করেন। বুধ থেকে মঙ্গল এবং কয়েকটি গ্রহাণু এই অঞ্চলের বাসিন্দা। আমাদের পৃথিবী লৌহশিলা অঞ্চলেরই একজন অধিবাসী।

বলয়ের মধ্যে লৌহশিলার পরিমাণ ছিল নিতান্ত কম। সেই কারণে উক্ত অঞ্চলে উৎপন্ন হতে পারেনি বৃহস্পতি বা শনির মত এত বড় বড় গ্রহ। অপর দিকে বুধ ও মঙ্গল এই অঞ্চলের একেবারে প্রান্তদেশে অবস্থান করার জন্য চারদিক থেকে বস্তুখণ্ডকে আকর্ষণ করে টেনে আনতে পারেনি। কেবল একপাশ থেকে বস্তুকণা সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছিল। তাই বুধ ও মঙ্গল আকারে ছোট। পৃথিবী ও শুক্র মধ্যস্থলে থেকে নিজেদের দেহ গঠন করেছিল বলে চারপাশ থেকে সংগ্রহ করেছিল বস্তুকণা। সেই কারণে ওদের শরীরটা বুধ ও মঙ্গল অপেক্ষা অনেক বড়। হয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, লৌহ-শিলা অঞ্চলে ধাতু, ধাতব অক্সাইড, ধাতব সিলিকেট, শিলাখণ্ড প্রভৃতি যেমন ঘনীভূত হয়েছিল তেমনই ঘনীভূত হয়েছিল কিছু কিছু ভারী হাইড্রোকারবন জাতীয় পদার্থ। প্রাথমিক অবস্থায় যখন ছোট ছোট বস্তুকণা একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে বড় পিণ্ডের রূপ গ্রহণ করেছিল তখন ঐ তেলতেলে হাইড্রোকারবন জাতীয় পদার্থরাই গায়ে গায়ে আটকে রাখতে সাহায্য করেছিল এবং আবর্তন সত্ত্বেও পুনরায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারেনি।

লৌহশিলা অঞ্চল ত্যাগ করার পর বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তেল, জল ও অ্যামোনিয়া। বিজ্ঞানীদের মতে এই উপাদানগুলিই বলয়ে ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই ওদের দ্বারা সৃষ্ট বৃহস্পতি ও শনি আকারে সুবৃহৎ। অপরদিকে বৃহস্পতি ও শনির উপগ্রহের সংখ্যাও বড় কম নয়। বৃহস্পতির উপগ্রহ সংখ্যা তেরটি এবং শনির ন'টি। এদের উপগ্রহগুলির এক-একটি আয়তনে এত বড় যে তারা যদি সূর্যের চারপাশে ঘুরত তাহলে গ্রহ রূপেই পরিচিত হতো। বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিডের আকার প্রায় বুধের মত, শনির উপগ্রহ টাইটান বুধ অপেক্ষা বড় এবং মঙ্গল অপেক্ষা সামান্য ছোট। (টাইটানের ব্যাস ৩৫৫০ মাইল, মঙ্গলের ৪২০০ মাইল এবং বুধের ২৯০০ মাইল)

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, আমাদের সৌরজগতে যত গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি আছে তাদের সম্মিলিত ভরের প্রায় দ্বিগুণ একা বৃহস্পতির ভর। আয়তনে এত বিশাল যে, তার অভ্যন্তরে ১৩০০ পৃথিবী স্থান পেতে পারে। শনির আয়তনও কম নয়। বৃহস্পতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। শনির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের উনিশগুণ আর পৃথিবীর ব্যাসের বাইশ গুণ বৃহস্পতির ব্যাস। বলয়ে এত বেশি তেল, জল, অ্যামোনিয়া ছিল যে তার দ্বারা বিশাল আয়তনের দুটি গ্রহ, বাইশটি উপগ্রহ এবং বেশ কয়েকটি গ্রহাণুর সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলকে বলা হয় তেল-জল অঞ্চল। এই অঞ্চলে লৌহশিলা যে আদৌ ঘনীভূত হয়নি এমন নয়। তেল, জল, অ্যামোনিয়ার তুলনায় লৌহশিলার পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ হলেও সামগ্রিক হিসাবে পরিমাণটা নিতান্ত কম নয়।

সর্বশেষে বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল হালকা হাইড্রোকারবন ও নিয়ন গ্যাস। ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর ভাগ্যে জুটেছে কেবল এইগুলিই। তেল, জলও কিছু কিছু পেয়েছে। কিন্তু ধাতব পদার্থ, শিলা প্রভৃতি একেবারে পায়নি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্লুটোর সীমা পরিত্যাগ করে যাওয়ার পর বলয়ে অবশেষ রূপে ছিল প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। মিথেন ও নিয়ন গ্যাস হয়ত কিছু ছিল। হয় এরা সূর্যের দশম গ্রহ সৃষ্টি করেছে নয়ত মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। অনেকের মতে সূর্যের দশম গ্রহ আছে এবং আয়তনে শনিগ্রহের প্রায় তিনগুণ। তবে ভর তার নিতান্তই কম।

পৃথিবীর কোন দূরবীন এ পর্যন্ত সূর্যের দশম গ্রহকে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। কেবল অনুমান, সূর্য থেকে প্রায় ছ শ' কোটি মাইল দূরে—একেবারে সৌর-জগতের শেষ প্রান্তে অবস্থান করছে গ্রহটি। বিজ্ঞানীদের অনুমান যদি সত্যই হয়, তাহলেও বলতে হবে বলয়ে অবশিষ্ট সমূহ গ্যাস সেখানেও ঘনীভূত হতে পারেনি। কিছু কিছু হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অবশ্যই উদ্বৃত্ত হয়েছিল। সেগুলি প্রায় ছশ' কোটি মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করে আমাদের সৌরজগৎ পরিত্যাগ করে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

উপরোক্ত বলয় মতবাদটি মেনে নেওয়ার পক্ষে বিজ্ঞানীরা যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন সে সম্বন্ধে এবার একটু আলোচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, বর্তমানে সূর্যের যা ভর তার সঙ্গে অন্ততঃপক্ষে হাজার তিনেক পৃথিবীর সমান বস্তু যোগ করলে তবেই আবর্তনবেগ প্রবল হয়ে এবং বিষুবপ্রদেশ স্ফীত হয়ে বলয় মুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নির্ণয়

করেছেন, বর্তমানে সৌরজগতে যত বস্তু আছে তাদের একত্রিত করলে বড় জোর সাড়ে চারশ পৃথিবীর ভরের সমান হয়। বলয় মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আড়াই হাজার পৃথিবীর ভরের সমান বস্তুর গরমিল হয় কেন?

বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আদিতে সূর্যের ভর ঐ রকমই ছিল। তবে সূর্যদেহে হাইড্রোজেনের পরিমাণই ছিল সর্বাধিক। গ্রহ উপগ্রহাদির জন্মদানের পর অবশেষ রূপে যে হাইড্রোজেন উদ্বৃত্ত হয়েছিল, তার ভর কম করেও ছিল আড়াই হাজার পৃথিবীর ভরের সমান। সেগুলি সবই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত অনুমানকে সত্য বলে ধরে নিলেও আর একটা হিসাবের গরমিল এসে যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সূর্যদেহের উপাদান নির্ণয় করেছেন। তাতে দেখা গেছে, সূর্যদেহে পার্থিব উপাদানের পরিমাণ শতকরা মাত্র এক ভাগের মত। যদি আদিতে সূর্যদেহের উপাদান ঐ রকমই ছিল, তাহলে মাত্র তিন হাজার কেন আরও কয়েক হাজার পৃথিবীর ভরের সমান ভরযুক্ত বলয় হলেও সৌরজগতে এতগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভব হতো, যদি সূর্যদেহে পার্থিব বস্তুকণার পরিমাণ অন্ততঃ শতকরা পনের ভাগের মত থাকত।

বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রেও একটা অনুমানকে খাড়া করেছেন। তাঁরা মনে করেন, আদিতে সূর্যদেহে পার্থিব বস্তুর পরিমাণ বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশিই ছিল। বলয় মুক্ত হওয়ার পর আপন আকর্ষণবল দ্বারা সূর্য যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেনকে ফিরিয়ে এনেছিল স্ব-দেহে। কোটি কোটি মাইল দূর পর্যন্ত চলেছিল তার শোষণ। অত্যন্ত হাল্কা বলে ঐ হাইড্রোজেনরাই ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল সূর্যদেহে এবং তার পরিমাণও বড় কম নয়। ফলে সূর্যদেহে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্থিব বস্তুর অনুপাত অনেকখানি কমে গেছে।

আপাততঃ বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত যুক্তিগুলিই মেনে নিতে হবে। তবে আজ পর্যন্ত যত মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, সব মতবাদেই বলা হয়েছে সূর্যদেহ থেকে গ্রহদের উৎপত্তি। তাই আমরাও নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আমাদের পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে সূর্য থেকে। বলয় মতবাদকে সমর্থন করে আমরা আরও বলবো, আজ থেকে প্রায় চারশ ষাট কোটি বছর আগে সূর্যদেহের বিষুবপ্রদেশ স্ফীত হয়ে উৎপন্ন হয়েছিল এক বলয়। বলয় থেকে বস্তুকণা বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীর এই বিশাল দেহটাকে গঠন করতে লেগেছিল আরও কয়েক

কোটি বছর। কালের হিসাব অবশ্য এখানে সঠিক মিলবে না। কারণ, এসব ক্ষেত্রে কাল মহাকালের কুক্ষিগত।

যতদিন না পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে ততদিন বলয় ও উল্কা মতবাদের সম্মেলনকেই মেনে নিতে হবে।

পৃথিবীর গঠন

গ্রহসৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনাকালে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবী লৌহশিলা অঞ্চলের বাসিন্দা। তাই তার দেহটা প্রধানত লৌহ ও পাথর দিয়ে গঠিত। তবে লৌহ ছাড়াও অন্যান্য ধাতু, ধাতব অক্সাইড এবং ধাতব সিলিকেটের পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ নয়। বিশেষতঃ পৃথিবীর মাটিতে সর্বত্র কিছু না কিছু অ্যালুমিনিয়াম ও সোডিয়ামের যৌগিক মেশান আছে।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে সাধারণত ৪০০০ মাইল ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, আমরা পৃথিবীর উপরিভাগকে যেমনটি দেখছি, অভ্যন্তরভাগ তেমনটি নয়। মাটি খুঁড়ে যতই নিচে প্রবেশ করা যাবে ততই দেখা যাবে নানা স্তর বিন্যাস (অনেকটা শামুকের খোলের মতো) এবং তাপমাত্রাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কেন্দ্রের দিকে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সেখানে কোন পদার্থ কঠিন অবস্থায় নেই। গলিত তরল পদার্থ সবসময় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত প্রধান তিনটি স্তর। শিক্ষার্থী মাত্রেই জানে, ধাতব-পাথরকে গলিয়ে যখন ধাতু নিষ্কাশন করা হয় তখন গলিত ধাতুর উপর ভেসে থাকে ধাতুমল বা গাদ। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কেবলমাত্র গলিত ধাতু ও পাথর দ্বারা পূর্ণ থাকায় উপরে গাদের মত ভেসে আছে শক্ত একটি আবরণ। এই আবরণটিকে বলা হয় ভূত্বক। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যেখানে ৪০০০ মাইল সেখানে উপরের এই আবরণটা অর্থাৎ ভূত্বক মাত্র চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ মাইলের মত গভীর। কারও কারও মতে ভূত্বকের গভীরতা আরও কম। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, কোটি কোটি বছরের প্রচেষ্টায় পৃথিবী স্থান বিশেষে মাত্র সাত থেকে পঁচিশ মাইলের মত শক্ত আবরণ তৈরি করতে পেরেছে। তা আল্পস পর্বতমালার পূর্ব প্রান্তে সবচেয়ে গভীর, চুয়াল্লিশ মাইলের মতো।

এই আবরণ বা ভূস্তর প্রধানত গ্রানাইট, ব্যাসল্ট প্রভৃতি পাথর দিয়ে গঠিত এবং সবার উপরে আছে মাটি, বালি, জল প্রভৃতি। ভূত্বকের গড়-ঘনত্বের সূচক আনুমানিক ২'৮।

ভূত্বক থেকে প্রায় ১৮০০ মাইল গভীর পর্যন্ত গলিত পাথরের স্তর। এখানকার উপাদান যত ভারী ভারী পাথর, লোহা ও অন্যান্য ধাতু। ওদের কোনটিই কঠিন অবস্থায় নেই। তার একমাত্র কারণ, এখানকার ভয়ঙ্কর তাপ মাত্রা। এমনিতে দেখা গেছে পৃথিবীর মাত্র দেড় মাইল গভীরে তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাঙ্কের সমান অর্থাৎ ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যদিও তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান নয় তথাপি ভূ-স্তর ভেদ করে মাত্র ত্রিশ মাইল গভীরে গেলেই তাপমাত্রার পরিমাণ হবে দেড় হাজর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। চল্লিশ মাইল গভীরের তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় কোন ধাতু বা ধাতব পাথর কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না। সবই আছে তরল অবস্থায়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে গলিত লাভা নির্গত হয় তা এতদূর থেকেও বাহিত হয় না। বড় জোর ত্রিশ মাইল গভীর থেকে পদার্থসমূহকে উৎক্ষিপ্ত করে। কারণ এই অল্প গভীরেও তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ কিছু কম নেই। ভূত্বকের পরবর্তী এই স্তরকে ভূ-বিদ্যায় ম্যান্‌টেল বলে। এই স্তরের ঘনত্ব উর্ধদেশে জলের ৩'৩ গুণ থেকে নিম্নদেশে ৫'৫ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

১৮০০ মাইল গভীর থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ২২০০ মাইল ধরে গলিত লোহের স্তর। সর্বনিম্ন এই স্তরের বৈজ্ঞানিক নাম কোর্ বা অষ্ঠি, এখানে তাপমাত্রা অতি ভয়াবহ। গলিত লোহ টগবগ করে ফুটছে। এখানকার লোহের ঘনত্ব আবার পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ খনি থেকে প্রাপ্ত লোহ অপেক্ষা অনেক-অনেক গুণে বেশি। এখানকার চাপ ও তাপ এত প্রচণ্ড যে কল্পনার মধ্যেও আনা যায় না। এই স্তরের কেন্দ্রস্থলে ঘনত্ব জলের তুলনায় ১২'৫ থেকে ১৮ গুণ বেশি।

পৃথিবীর এই এককেন্দ্রী স্তর তিনটি শুধু ঘনত্ব ও বেধে পৃথক নয়, দার্ঢ্য ও অন্যান্য ভৌত ধর্মেও আলাদা। পৃথিবীর জন্মের পর থেকে প্রায় চারশ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ মাত্র চল্লিশ মাইল পর্যন্ত কঠিনে রূপান্তরিত হয়েছে। এককথায় পৃথিবীর ৮০০০ মাইল ব্যাসের মধ্যে ৭৯০০ মাইলই গলিত পদার্থে পরিপূর্ণ। আরও কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ভূত্বকের গভীরতার বিশেষ তারতম্য ঘটবে না।

তার কারণ, উপরের চাপের প্রভাবে অভ্যন্তরে তাপের উৎপত্তি হচ্ছে। পৃথিবীর কেন্দ্রের উপর সব সময় পড়ছে উপরের চার হাজার মাইল ব্যাপী ভারী পদার্থের প্রচণ্ড চাপ। অতএব পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ কোনদিনই শীতল হবে না। তবে এও সত্য যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও একমত হতে পারেননি।

অনেকে মনে করতে পারেন, মানুষ যে মাটি কেটে খনির নিচে নামছে এবং পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত করছে তাহলে কেন জানবে না অভ্যন্তরের খবর?

সত্য কথা। কিন্তু তাঁদের জানাই যে, কয়লা থাকে পৃথিবীর মাটির তলায় মাত্র আধ মাইল গভীরে। অর্থাৎ কয়লা উত্তোলন করতে হলে এক মাইল গভীরেও যেতে হচ্ছে না। অপরদিকে পেট্রোলিয়ামকে উত্তোলিত করতে যে নল ব্যবহার করা হয় তার দৈর্ঘ মাত্র ১৫০০০ ফুট বা তিন মাইলেরও কম। অতএব মানুষ শ' শ' মাইল গভীরের সংবাদ সংগ্রহ করবে কেমন করে?

পৃথিবীর আকার

সুদূর অতীতে মানুষ যেদিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল পৃথিবীর পানে, সেদিন দেখেছিল পৃথিবী একটি সমতল ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ভেবেছিল পৃথিবীর প্রান্তসীমা অবশ্যই আছে। আরও মনে করতো, উপরের ঐ নীল আকাশটা নেমে-এসে স্পর্শ করেছে পৃথিবীর প্রান্তদেশকে। বিরাট এক নীল চন্দ্রাতপ দিয়ে কে যেন ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রাচীন কালের মানুষ কত কল্পনার রঙিন জাল বিস্তার করেছিল এবং রচনা করেছিল কত গল্প কত কাহিনী।

পৃথিবী যে সমতল ক্ষেত্র নয়—এই ধারণার পরিবর্তন হতে অনেক সময় লেগেছিল মানুষের। তবে একথাও সত্য যে, আজ থেকে প্রায় হাজার বছরেরও অধিককাল পূর্বে কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী গোলাকার।

সুবৃহৎ এই পৃথিবীর অতি অল্পস্থানের উপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হয় বলে আমরা পৃথিবীকে সমতল দেখি। পৃথিবী গোলাকার বলেই নীল আকাশটা নেমে এসে পৃথিবীর প্রান্তসীমার সঙ্গে মিশে-গেছে মনে হয়। ভূমি থেকে দশ ফুট উপরে চোখ রেখে দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত না হলে সক্ষম চোখে

দিগন্তকে ৪'১ মাইল দূরে দেখা যায়। উড়োজাহাজে চড়ে মাটি ছেড়ে যতই উপরে ওঠা যাবে ততই দেখা যাবে পৃথিবীর দিগন্তরেখা পর পর দূরে সরে যাচ্ছে। আজকাল আবার মানুষ কৃত্রিম যানে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। মহাকাশচারীরা দেখেছেন, আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্কের মতই পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান একটি গোলক। তার উপরে এবং নিচে কোথাও কোন অবলম্বন নেই।

পৃথিবীপৃষ্ঠেও কতকগুলি পরীক্ষা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবী গোলাকার। প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে চন্দ্রগ্রহণের কথা। চন্দ্রের আংশিক অথবা পূর্ণগ্রাসের পূর্বে ও পরে মনে হয় একটি বৃত্তাকার কালো ছায়া যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে চন্দ্রকে গ্রাস করতে। পৃথিবী যদি একটি গোলক না হতো তা হলে ঐ ছায়া কিছুতেই গোলাকার হতো না। কারণ আমরা জানি, কোন পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়।

দ্বিতীয়ত পৃথিবীপৃষ্ঠ যদি সমতল হতো তাহলে পৃথিবীর সব দেশের লোক একই সময়ে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখতো। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হয়।

দু-একটি পরীক্ষার কথাও বর্ণনা করা যেতে পারে। বহুদূর বিস্তৃত একটি ফাঁকা মাঠে সমদূরত্বে এবং একই সরলরেখায় সমান দৈর্ঘ্যের কতকগুলি খুঁটি পুঁতে তাদের শীর্ষদেশ দূরবীনের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, দু'পাশের দুটি খুঁটি অপেক্ষা মাঝখানের খুঁটিগুলির শীর্ষদেশ উঁচুতে আছে এবং একেবারে মাঝখানের খুঁটিটির মাথা সব খুঁটির মাথাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া জাহাজ যখন বন্দরের দিকে এগিয়ে আসে তখন তীরে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, আগে জাহাজটির মাস্তুল ভেসে উঠবে জলের উপরে। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হবে জাহাজের উপর থেকে নিচের অংশগুলি।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ থেকেই বহু পূর্বে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার। এখন অবশ্য বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, পৃথিবী গোলাকার বটে কিন্তু একেবারে ফুটবলের মত নয়। তাকে নিজ অক্ষের উপর মেরুকে অবলম্বন করে ২৪ ঘণ্টায় একবার করে পাক খেতে হচ্ছে। তাই মাঝখানটা ফুলে উঠেছে এবং মেরু দুটি কিছুটা ঢুকে পড়েছে ভেতরের দিকে। ফুলে ওঠা জায়গাকে বলা হয় বিষুব প্রদেশ। পৃথিবীর মাঝখান বরাবর একটি রেখার কল্পনা করা হয়েছে। রেখাটি যেন

বলয়ের মত ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। ঐ রেখাটির নামকরণ করা হয়েছে বিষুব রেখা। পৃথিবীর উত্তরের মেরুটাকে বলা হয় উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণের মেরুটিকে বলা হয় দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু। বিষুব রেখা ধরে পৃথিবীর পরিধি মাপলে হয় ২৪৯০২ মাইল এবং বিষুব প্রদেশে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল। কিন্তু দুই মেরুর ব্যবধান ৭৯০০ মাইল। অর্থাৎ মেরুদ্বয়ের ব্যবধান পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ২৬ মাইল কম। ঐ ২৬ মাইল কম না হয়ে মেরুদ্বয়ের ব্যবধান যদি ব্যাসের সমান হতো তাহলেই পৃথিবী একেবারে ফুটবলের মতই গোলাকার হতো। *দুই মেরু বরাবর পৃথিবীর পরিধি মাপলে ২৪৮৬০ মাইল* হয়ে থাকে।

বিষুব রেখা থেকে উত্তরে এবং দক্ষিণে অক্ষাংশ গণনা করা হয়। বিষুব রেখার উপর অক্ষাংশের মান শূন্য। এই কারণে রেখাটিকে নিরক্ষ রেখাও বলা হয়। নিরক্ষ রেখা থেকে উত্তর দিকে অক্ষাংশ গণনা করলে হয় উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণ দিকে হয় দক্ষিণ অক্ষাংশ। সুমেরুতে এবং কুমেরুতে অক্ষাংশ যথাক্রমে ৯০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ। তাই অক্ষাংশ ০ ডিগ্রি থেকে ৯০ ডিগ্রি এবং যেখানকার অক্ষাংশ যত বেশি সেখানকার পৃথিবীর বৃত্ত পরিধি তত কম। প্রতি ডিগ্রি অক্ষাংশের দৈর্ঘ আনুমানিক ৬৯ মাইল। দ্রাঘিমার দৈর্ঘ কিন্তু প্রতি ডিগ্রিতে সমান নয়, ০ ডিগ্রি অক্ষাংশে, প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার দৈর্ঘ ৬৯ মাইল-ই, কিন্তু অক্ষাংশের ডিগ্রি বৃদ্ধি পেলে এই দৈর্ঘ ক্রমে ক্রমে কমতে থাকে। যেমন ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার দৈর্ঘ ৫৯ মাইল, ৬০ ডিগ্রি অক্ষাংশে ৩৪·৫ মাইল, ৯০ ডিগ্রি অক্ষাংশে শূন্য মাইল, ইত্যাদি। দ্রাঘিমার ১৫ ডিগ্রির তারতম্যে সময়ের একঘণ্টা তারতম্য হয়ে থাকে, এই জন্য দেশ থেকে দেশে *সময়ের পার্থক্য দেখা যায়।*

নিরক্ষরেখা থেকে ২৩½ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে আরও দুটি রেখার কল্পনা করা হয়েছে। উত্তরের রেখাটিকে বলা হয় কর্কটক্রান্তি এবং দক্ষিণের রেখাটিকে বলা হয় মকর ক্রান্তি।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি যথাক্রমে ৭৯২৬ মাইল এবং ২৪৯০২ মাইল ধরা হলেও সাধারণভাবে এই দুটির মান ধরা হয় ৮০০০ মাইল এবং ২৫০০০ মাইল। পৃথিবীর বস্তুরাশির গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫·৫১৭।

পৃথিবীর গতি

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় আপন অক্ষ অবলম্বনে একবার করে পাক খায়—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সে পাক খাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। তাই আমরা সূর্যকে পূর্ব দিকে উদয় হতে এবং পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি। এই সহজ সত্যটা মানুষ কিন্তু স্বীকার করেছে অনেক পরে অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র শ' তিনেক বছর আগে। আর্যভটই প্রথম বিজ্ঞানী—যিনি উক্ত সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন কেউ আস্থা স্থাপন করেন নি তাঁর কথায়। আর্যভটের মৃত্যুর প্রায় হাজার বছরেরও অধিককাল পরে কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও ঐ একই কথা ঘোষণা করেন। এবারও মানুষ আমল দেয়নি। পরে বিজ্ঞানী নিউটনই সত্যটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২৪ ঘণ্টায় একবার পূর্ণ আবর্তনকে বলা হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি। নিরক্ষ অঞ্চলে সাধারণভাবে পূর্ণ আবর্তনকালের অর্ধেক সময়কে দিন এবং অর্ধেক সময়কে রাত্রি বলা হয়। দিনরাত্রির পূর্ণ বিবরণ যথাস্থানেই উল্লেখ করা হবে।

পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিতে আবর্তন করতে করতে ৩৬৫¼ দিনে বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসে। ঐ সময়কে আমরা বছর বলি। যে পথে পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করে সেই পথকে বলা হয় পৃথিবীর কক্ষপথ। কিন্তু কক্ষপথটি ঠিক বৃত্তাকার নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে এক উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসে। সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণের নাম পৃথিবীর বার্ষিক গতি। পৃথিবী আপন কক্ষপথে সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে যে কোন একটি স্থান থেকে যাত্রা করে পুনরায় সেই স্থানে ফিরে আসতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। এই হিসেব থেকে পৃথিবীর কক্ষপথ যে কত বড় তা সহজে অনুমান করা যায়।

পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার বলে বছরের কোন কোন সময় পৃথিবী সূর্যের সন্নিকটবর্তী হয় আবার কোন কোন সময় একটু দূরে সরে যায়। যখন সূর্যের সন্নিকটে আসে (জানুয়ারি মাসের কাছাকাছি সময়ে) তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হয় ৯ কোটি ১৪ লক্ষ মাইল আর জুলাই মাস নাগাদ দূরে সরে

গেলে দূরত্বটা বেড়ে হয়ে যায় ৯ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল। এই দুই দূরত্বের গড়কে অর্থাৎ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইলকে সাধারণত সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ধরা হয়।

আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ছাড়াও পৃথিবীর আর এক রকমের গতি আছে। সেই গতিকে বলা হয় অয়ন গতি। আমরা জানি, পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণবল কাজ করছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথিবীর জলরাশিতে জোয়ার ভাটা দেখে। পৃথিবীর বিষুব প্রদেশের উপর সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণবলের মাত্রা অধিক। সেই কারণেই পৃথিবী যখন সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে তখন তার মেরুদেশও শূন্যে পাক খেতে খেতে এগিয়ে যায়। যে ভাবে পৃথিবী পাক খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে তাকে একটা কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করলে একটি বৃত্তের আকার হয়।

উদাহরণস্বরূপ পণ্ডিতেরা ছোট ছেলেদের লাট্টু ঘোরানোর কথাটা উল্লেখ করে থাকেন। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লাট্টু ঘুরতে ঘুরতে যখন তার আবর্তনবেগ একটু কমে যায় তখন সে সোজা না থেকে একটু কাৎ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সে ঘোরে অথচ তার মাথাটা শূন্যে ছোট ছোট বৃত্ত রচনা করে। যেহেতু পৃথিবী একটি লাট্টুর তুলনায় কোটি কোটি গুণে বড় তাই তার মেরুর দ্বারা রচিত বৃত্তও সুবৃহৎ। অপরদিকে পৃথিবীর মেরুকে একবার উক্ত বৃত্তের চারদিকে ঘুরে আসতে সুদীর্ঘ সময়ের দরকার হয়। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রায় ছাব্বিশ হাজার বছরে মাত্র একবার ভূমেরু উক্ত বৃত্তের চারদিকে পরিক্রমা করে আসে।

পৃথিবীর বার্ষিকগতির জন্য আকাশের কোন নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জকে বছরের সব সময় আমরা আকাশের একটি নির্দিষ্ট স্থানে দেখতে পাই না। বছর অন্তে তাকে আবার যথাস্থানে দেখা যায়। কিন্তু উত্তরের ধ্রুবতারার স্থান পরিবর্তন হয় না। সেটি স্থির থাকে এবং ঐ কারণেই আমরা "ধ্রুবতারা" বলি। মনে হয়, পৃথিবী যেন ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট রেখে পথ পরিক্রমা করছে। কিন্তু পৃথিবীর অয়নগতির জন্য এই ধ্রুবতারাও আবহমানকাল ধরে নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না। আমাদের জীবনকাল অতি সামান্য। তাছাড়া পৃথিবী বয়সের কাছে নগণ্য দু-তিন হাজার বছরের ব্যবধান এমন কিছুই নয়। হাজার চারেক বছর আগের কোন মানুষ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে অবশ্যই বলতো, তার ছেলেবেলায় সে ধ্রুবতারাকে ঠিক উত্তরে দেখতে পেত না।

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরে অয়নগতির জন্য আবার পৃথিবীর

লক্ষ্যস্থল পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন উত্তরে ধ্রুবতারার পরিবর্তে দেখা যাবে "শিবি" নামক নক্ষত্রটিকে। অর্থাৎ তখন পৃথিবী শিবি নক্ষত্রটির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে পথ পরিক্রমা করবে। শিবির পরে আসবে আরও কয়েকটি নক্ষত্র-মণ্ডল। অবশেষে আজ থেকে ছাব্বিশ হাজার বছর পরে পুনরায় ধ্রুবতারা আসবে উত্তরে।

পৃথিবীর অয়ন চলনের জন্য আরও কিছু কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয় অথচ আমরা তা ভালভাবে বুঝতে পারি না। যেমন আমরা সবাই জানি ২১শে মার্চ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর দিন রাত্রি সর্বত্র সমান হয়। কিন্তু আবহমান-কাল ধরে এই নিয়ম চলে আসছে না। প্রতি ৭২ বছরে উক্ত তারিখদ্বয়ের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ প্রতি ৭২ বছরে মাত্র একটি দিন পশ্চাতে সরে আসে। এর ফল পৃথিবীর ঋতুর উপরও পতিত হয়। হাজার চারেক বছর আগে পৃথিবীতে যে সময় যে ঋতু আসতো এখন সেই সময় সেই ঋতু আসে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রাদির উল্লেখ থেকে।

বহু ভারতীয় শাস্ত্র রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের হাজার হাজার বছর আগে। সেইসব শাস্ত্রে "মধু" ও "মাধব" অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখকে ধরা হয়েছে বসন্ত ঋতুর মাস। কিন্তু আমরা এখন দেখি, বসন্ত ঋতু ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস। প্রাচীন শাস্ত্রকাররা ভুল উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ তখন বসন্ত আরম্ভ হতো ফাল্গুন মাসেই। একটি সাধারণ হিসাবের মাধ্যমেই ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

যেহেতু অয়ন চলনের জন্য প্রতি ৭২ বছরে দিনরাত্রি ১ দিন পেছনে সরে এসে সমান হয়। আজকের ৭ই চৈত্রকে দিনরাত্রি সমান ধরলে ৭২ × ৩০ বা ২১৬০ বছর আগে ৭ই চৈত্রের ৩০ দিন পরে অর্থাৎ ৭ই বৈশাখ হয়েছিল দিনরাত্রি সমান। সেদিন ৭ই বৈশাখে এসেছিল বসন্ত। পরবর্তী মাস অবশ্যই গণ্য হয়েছিল গ্রীষ্ম ঋতুর মাস হিসাবে। হয়েছিলও তাই। গুপ্ত যুগে পঞ্জিকা সংশোধিত করে বৈশাখকে গ্রীষ্ম ঋতুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে আর অয়ন চলনের জন্য পঞ্জিকা সংশোধন করা হয়নি। প্রায় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় ত্রুটি অনেকখানি এসে গেছে।

বর্তমানে অয়ন চলনের প্রভাব কিভাবে পৃথিবীর ঋতুর উপর প্রতিফলন হয় নিম্নে তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হ'ল।

পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তরাল করে আকাশে একটি বিরাট বৃত্তের কল্পনা করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। অপরদিকে সূর্য আপাতদৃষ্টিতে আকাশে

যেভাবে পরিক্রমা করছে সেই বৃত্তাকার পথকেও একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করেছেন। প্রথম বৃত্তাকার রেখাটির নাম আকাশবিষুব এবং পরবর্তীটির নাম রবিমার্গ বা ক্রান্তি বৃত্ত। এই দুই কল্পিত বৃত্ত মাত্র দুটি জায়গায় ছেদ করেছে। একটি ছেদবিন্দুর নাম মহাবিষুব বা বাসন্তবিষুব এবং অপরটির নাম জলবিষুব বা শারদবিষুব। ইংরাজীতে বিন্দুদ্বয়ের নাম ভারন্যাল ইকুইনক্স (Vernal equinox) ও অটামন্যাল ইকুইনক্স (Autumnal equinox)। বছরের দুটি দিন সূর্য ঐ বিন্দুদ্বয়ে অবস্থান করে। তাই ঐ দুদিন অর্থাৎ ২১শে মার্চ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্বত্রই দিনরাত্রির দৈর্ঘ সমান হয়।

কিন্তু পৃথিবীর মেরু শূন্যে বৃত্তকার পথে পরিভ্রমণ করে বলে নিরক্ষবৃত্ত সব সময় একই সমতলে থাকতে পারে না। ঐ কারণের জন্যই আকাশ-বিষুবের স্থান পরিবর্তন ঘটে। আকাশবিষুব ও রবিমার্গ দুটো যদি স্থির থাকতো, তাহলে ছেদ বিন্দুদ্বয় যথা মহাবিষুব ও জলবিষুব চিরকাল ধরেই স্থির থাকতো এবং যতদিন পৃথিবী থাকতো ততদিন পূর্বোক্ত দুটি তারিখেই দিন রাত্রি সমান হতো। কিন্তু অয়ন চলনের জন্য আকাশবিষুব স্থির থাকে না। প্রতিবছর একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়। ফলে মহাবিষুব ও জলবিষুব বিন্দু দুটিও রবিমার্গের উপর সঞ্চরণ করে। এই সঞ্চরণের পরিমাণ বছরে $\frac{১}{৭২}$ ডিগ্রি। তাই ৭২ বছরে ছেদ বিন্দুদ্বয়ের পরিবর্তন ঘটে মাত্র ১ ডিগ্রি। যেহেতু পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিন্দু সরে আসে এবং মহাবিষুববিন্দু যতখানি পশ্চিমে সরে আসে জলবিষুব ঠিক ততখানি বিপরীত দিকে সরে যায়। ক্রান্তিবৃত্তের উপর যেহেতু প্রতি ৭২ বছরে এক এক ডিগ্রি করে সরে আসছে, সেই কারণে ৩৬০ ডিগ্রি পরিভ্রমণ করতে সময় লাগে ৭২ × ৩৬০ বছর বা ২৫৯২০ বছর। পণ্ডিতেরা এই সময়টাকে ধরেছেন ২৬০০০ বছর। অর্থাৎ আজকে আমরা যেমন ২১শে মার্চ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখ দুটিতে দিনরাত্রি সমান দেখছি আজ থেকে ২৬০০০ বছর পরে ঠিক এমনটি দেখবো। অপরদিকে ৭২ বছর পরে তারিখ দুটি পরিবর্তিত হয়ে একদিন করে সরে আসবে। অর্থাৎ ৭২ বছর পরে ২০শে মার্চ এবং ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিনরাত্রি সমান হবে। কিন্তু এই পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে সাধারণভাবে ধরা যায় না। সেই কবে হয়ত কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল! সেদিন মহাবিষুববিন্দু যেখানে ছিল সেখান থেকে হয়ত মাত্র ৪৫ ডিগ্রি পশ্চিমে সরে এসেছে। ঋতু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেদিন থেকে মাত্র পয়তাল্লিশ দিনের হেরফের।

মহাকর্ষ

সাধারণভাবে মনে একটি প্রশ্ন আসে, পৃথিবী যদি মহাকাশে ভেসে আছে এবং যেহেতু তার কোন অবলম্বন নেই তাহলে কেন সে বৃন্তচ্যুত ফলের মত খসে পড়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে না? চারদিকে তো মহাশূন্য, তলিয়ে যাওয়ার অসুবিধা কোথায়? কেন সে আপন নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবহমানকাল ধরে সূর্যকে পরিক্রমা করছে? কত শত শত কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তবু কেন এ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হচ্ছে না?

পণ্ডিতেরা মনে করেন, বিশ্বজগৎ নিয়মে বাঁধা। কোথাও সামান্যতম নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। তাঁরা বলেন, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা কোন এক অদৃশ্য শক্তিতে একে অপরকে আকর্ষণ করে চলেছে। সেই আকর্ষণ বলের প্রভাবে বড় বড় বস্তুপিণ্ড ছোট ছোট বস্তুকে আপন আপন বুকে টেনে নেয়। যখন দূরত্ব বেশি থাকে তখন বড় বস্তুর আকর্ষণে ছোট বস্তু তার চারদিকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। ঐ কারণেই চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে এবং সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আমাদের পৃথিবী। অপর পক্ষে সূর্যও স্থির নয়। তাকেও পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে অধিকতর শক্তিশালী কোন এক কেন্দ্রবস্তুর চতুর্দিকে। আবার ঐ বস্তুটিও স্থির হয়ে নেই—তাকেও মহাকাশ পরিক্রমা করতে হচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে, বিশ্বের কোথাও কোন কিছুর স্থির হয়ে বসে থাকার উপায় নেই। সততই পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে। বিশ্বের এই নিয়মকে বলা হয় মহাকর্ষ।

আকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, এমনকি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর উপরিভাগে পড়ে থাকা ছোট্ট একটুকরো পাথরের মধ্যেও আছে মহাকর্ষশক্তি এবং প্রত্যেকেরই আছে কিছু না কিছু গতিবেগ। পৃথিবীর উপর যেকোন জায়গায় পড়ে থাকা একখানা ইট বা পাথর ভূপৃষ্ঠের গতিবেগের অংশীদার। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের পরিধি প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল এবং মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করছে। তাই বলা যেতে পারে নিরক্ষবৃত্তের উপর মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চব্বিশ ঘণ্টায় পরিভ্রমণ করছে পঁচিশ হাজার মাইল। নিরক্ষবৃত্ত থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে ক্রান্তি বৃত্তের উপর কোন বস্তুর আবর্তনবেগ কম হবে। কেননা,

ক্রান্তিবৃত্তের পরিধি নিরক্ষবৃত্ত অপেক্ষা অনেক কম। আমাদের কলকাতা শহরটা চলছে সারাদিনে ১৮০০০ মাইল পথ। কারণ, নিরক্ষ রেখা থেকে ২২.৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে তার অবস্থান বলে সেখানে পৃথিবীর পরিধি প্রায় আঠার হাজার মাইলের মত। অপরদিকে একেবারে মেরুবিন্দুতে পৃথিবীর পরিধি শূন্য বলে সেখানকার কোন বস্তুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাক খেতে হয়। অথচ বিশালকায় পৃথিবীর বুকে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মানুষ এসবের কিছুই টের পাচ্ছে না। কিন্তু মানুষ, জীবজন্তু থেকে আরম্ভ করে অতি ক্ষুদ্র এক প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেও এই গতিবেগ সঞ্চারিত। যদি এমন হতো যে, পৃথিবীটা হঠাৎ চুপসে গিয়ে ছোট হয়ে গেল এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল পাথরটা, তখন ঐ পাথরটাই (যদি দূরত্ব বেশি হয়) ঘুরতে আরম্ভ করবে পৃথিবীর চারদিকে ঠিক একটা উপগ্রহের মত।

প্রকৃতপক্ষে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেকের গতিবেগ আছে বলেই মহাকর্ষবল কাজ করা সত্ত্বেও একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে না। তা না হলে মহাবিশ্বের যেখানে যা-কিছু আছে সবাই একে অপরের উপর আছাড় খেয়ে খেয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত। তখন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র কোন কিছুই থাকতো না।

মহাকাশে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা অকল্পনীয়। ওদের সবার আছে গতিবেগ। সবাইকে ঘুরতে হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় শক্তির চতুর্দিকে। এই ঘোরার পেছনে একটা বড় বৈজ্ঞানিক সত্য কাজ করছে। সত্যটি নিম্নরূপ—

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক মহাকর্ষশক্তির অধীন এবং যে কোন দুটি জ্যোতিষ্ক একে অপরকে আকর্ষণ করে। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল সূর্যকে অবলম্বন করে তারই চারদিকে পরিভ্রমণ করছে নটি গ্রহ, তেত্রিশটি উপগ্রহ, ত্রিশ হাজারের মত গ্রহাণু, হাজার দশেকের মত ধূমকেতু এবং সহস্র সহস্র কোটি উল্কা। এই সমস্ত ছাড়াও সৌরজগতের সর্বত্র বিরলভাবে ছড়িয়ে আছে গ্যাসীয় অণু-পরমাণু ও ধূলিকণা। আশ্চর্যের কথা, এতগুলো সবই বিভিন্ন কক্ষপথে পরিক্রমা করে চলেছে সূর্যকে। তাহলে কত শক্তিধর এই সূর্য ?

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পরিক্রমারত গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু ইত্যাদির সম্মিলিত ভর অপেক্ষা একা সূর্যের ভর অনেক-অনেক গুণে বেশি। এক কথায় সূর্যের তুলনায় সৌরজগতের সমস্ত বাসিন্দার সম্মিলিত ভর অতি নগন্য বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা মোটামুটি ভাবে একটা হিসেবও দাখিল করেছেন। সেই হিসেব অনুযায়ী সৌরজগতের বাসিন্দা—সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ,

ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতির ভর একত্রে মাত্র পাঁচশ কিংবা ছশটি পৃথিবীর ভরের সমান। কিন্তু একা সূর্যের ভর তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার পৃথিবীর ভরের সমান এবং আয়তনে পৃথিবীর তের লক্ষগুণ।

সূর্যের সুদূরের গ্রহগুলি পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় হলেও তাদের গঠন উপাদান হালকা পদার্থ বলে ভর পৃথিবীর অনুপাতে যথেষ্ট কম। এত বড় যে বৃহস্পতি—যাকে গ্রহরাজ বলা হয়, যার বুকে ১৩০০টা পৃথিবী স্থান পেতে পারে এবং যার একার ভর সৌরজগতের সমস্ত বাসিন্দার সম্মিলিত ভরের প্রায় দ্বিগুণ—তারই নিজস্ব ভর মাত্র ৩২০টি পৃথিবীর ভরের সমান। ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো প্রভৃতির ভর আবার নিতান্তই কম। তাই হিসেব অনুযায়ী দেখা যায়, সূর্য ও গ্রহদের সম্মিলিত ভরকেন্দ্রটি অবস্থান করছে সূর্য দেহে—তার নিজস্ব কেন্দ্রবিন্দু থেকে একটু দূরে।

উক্ত কারনের জন্যই সূর্যের চারদিকে গ্রহদেরই পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে। অথচ সূর্য ওদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। পৃথিবী যে নিজের কক্ষপথে অব্যাহত অবস্থান করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে মহাকর্ষবল তার একমাত্র কারণ নয়। মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ও ঘুরন্ত বস্তুর বর্হিমুখী টানের দরুণ উদ্ভূত কেন্দ্রাতিগ বলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সমতার জন্য এটা সম্ভব হচ্ছে। সমভরযুক্ত দুটি জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। ধরা যাক, সূর্য ও পৃথিবী উভয়ের ভর ও আয়তন যদি সমান সমান হতো তাহলে উভয়ের কেন্দ্রবিন্দু থেকে মোট দূরত্বের মধ্যস্থলে থাকতো ওদের ভরকেন্দ্র। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের ভরকেন্দ্রের চতুর্দিকে আবর্তন করতো। আকাশের যুগল নক্ষত্রগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়মটি কাজ করছে।

অতএব সাধারণভাবে বলা যায়, গ্রহগুলির ভরকেন্দ্র সূর্যদেহে অবস্থান করার জন্য গ্রহরা সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। তেমনই পৃথিবী ও চন্দ্রের সম্মিলিত ভরকেন্দ্র পৃথিবীর দেহে অবস্থান করার জন্য চন্দ্রকে ঘুরতে হচ্ছে পৃথিবীর চার দিকে। বৃহস্পতির উপগ্রহ সংখ্যা যেহেতু তেরো, ঐ তেরোটি উপগ্রহ এবং বৃহস্পতির সম্মিলিত ভরকেন্দ্রটি অবস্থান করছে বৃহস্পতির দেহে। তাই বারটি উপগ্রহকে ঘুরতে হচ্ছে বৃহস্পতির চারদিকে।

মহাকর্ষ শক্তি সম্বন্ধে প্রথম আভাস দিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, পৃথিবী অনন্ত মহাশূন্যে ভেসে আছে। তার কোন অবলম্বন নেই। সে এদিকে ওদিকে কোথাও যেতে পারছে না। গেলে যাবেই বা কোথায়? চারদিকেই তো মহাশূন্য!

এর বেশি কোন বিশেষ তথ্য ভাস্করাচার্যের পুস্তক থেকে লাভ করা যায় নি। পরবর্তী কালে ভারতীয়দের ঔদাসীন্যের ফলে এবং উপযুক্ত গবেষণার অভাবে তাঁর মহান আবিষ্কারটি হারিয়ে গেছে। আধুনিককালে বিজ্ঞানী নিউটনই প্রকৃতপক্ষে মহাকর্ষের সমূহ নিয়ম-কানুন আবিষ্কার করে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন।

পৃথিবীর অভিকর্ষ

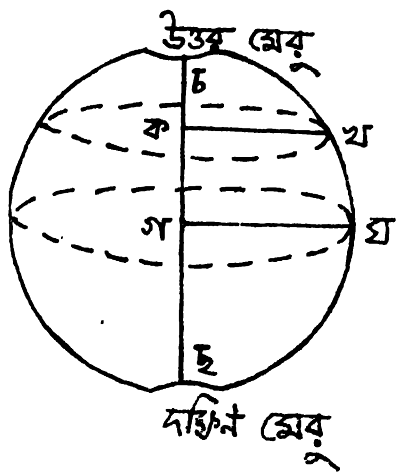
মহাবিজ্ঞানী নিউটন প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কল্পনা করেছিলেন। যদিও বর্তমানে "মাধ্যাকর্ষণ শক্তি" কথাটা প্রায়ই ব্যবহার করা হয় না। সর্বত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিবর্তে অভিকর্ষ কথাটাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অভিকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী, পৃথিবী তার উপরিস্থিত প্রত্যেকটি বস্তুকে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করছে। কেবল পৃথিবী নয়, আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। এমন কি প্রত্যেকটি বস্তুকণার মধ্যেও এই গুণ আছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পৃথিবীর এই আকর্ষণবল ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী স্থানে সর্বাধিক। কোন বস্তু ভারী বা হালকা মনে হয় অভিকর্ষের জন্য। যে বস্তুকে পৃথিবী যত জোরে আকর্ষণ করে সে বস্তু তত ভারী বলে মনে হয়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে উপরের দিকে অথবা মাটি খুঁড়ে নিচে নামলে আকর্ষণবল হয় কম। তাই পৃথিবীর অভ্যন্তরে একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অভিকর্ষের মান শূন্য। পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন বস্তুকে ওজন করলে যত হয় খনিগর্তে এবং পর্বতশীর্ষে উভয় স্থানে সে বস্তুকে ওজন করলে ওজন তদপেক্ষা কমই হবে। কিন্তু বিশেষ একটি জায়গায় এই সহজ হিসাবের একটু গরমিল হয়ে থাকে। যেমন পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের ব্যবধান বিষুব প্রদেশের ব্যাস অপেক্ষা ২৬ মাইল কম। অতএব পৃথিবীর অভ্যন্তরে তার নিজস্ব কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিষুব বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ মেরুর সে ব্যাসার্ধ নয়, প্রায় তের মাইল কম। সেই হিসাবে বিষুব প্রদেশে কোন বস্তুর ওজন যত হয় মেরুদেশে তার ওজন কিছুটা কম হওয়ারই কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, বিষুব প্রদেশ অপেক্ষা মেরুতে বস্তুর ওজন বেড়ে যায়। কারণটি নিয়ে ব্যাখ্যা করা গেল।

পৃথিবী তার উপরিভাগের যাবতীয় বস্তুকে নিয়ে উত্তর দক্ষিণ অক্ষরেখায়

চারদিকে একই কৌণিক বেগে আবর্তন করছে। এই ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বস্তুসমূহও বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরছে। নিরক্ষবৃত্তের উপর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বেশি এবং মেরু অঞ্চলে ব্যাসার্ধ কম। অতএব নিরক্ষ অঞ্চলের বস্তু যে ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরছে মেরু অঞ্চলের বস্তু ঘুরছে তার চেয়ে কম ব্যাসার্ধের বৃত্তে এবং মেরুদেশে ব্যাসার্ধ একেবারে শূন্য। চিত্রে ঘ বিন্দুতে বস্তু গ ঘ ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরছে এবং খ বিন্দুতে বস্তু ক খ ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরছে। ক খ অপেক্ষা গ ঘ বৃহত্তর। আবার চ ও ছ বিন্দুতে ব্যাসার্ধ শূন্য। অর্থাৎ মেরুদেশের বস্তু এক জায়গায় অবস্থান করেই আবর্তন করছে।



পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বস্তুর বিভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘূর্ণনের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ অভিকেন্দ্র বলের প্রয়োজন হয়—যা সংগৃহীত হয় ঐ স্থানের বস্তুর ওজন থেকে। নিরক্ষ অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বেশি, তাই বস্তুর ওজনও ব্যয়িত হয় বেশি। কিন্তু একেবারে মেরুতে ব্যাসার্ধ শূন্য বলে বস্তুর ওজন আদৌ ব্যয়িত হয় না। এই কারণেই নিরক্ষ প্রদেশ অপেক্ষা মেরুতে বস্তুর ওজন বেশি।

পৃথিবীর আকর্ষণবল তথা অভিকর্ষ থাকার জন্যই সেই আকর্ষণবলকে ছিন্ন করে উর্ধ্বাকাশে পাড়ি দেওয়া সহজ নয়। যদি বল প্রয়োগের দ্বারা কোন বস্তুকে উপরে উৎক্ষিপ্ত করা যায় তাহলে সেটি পুনরায় ফিরে আসে মাটিতে। কিন্তু দেখা গেছে, কোন বস্তুকে সেকেণ্ডে সাত মাইল বা ১১·২ কিলোমিটার গতি দান করলে সে বস্তু আর মাটিতে ফিরে আসবে না কোন কালে। অর্থাৎ পৃথিবীর মায়া পরিত্যাগ করে পৃথিবী থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে হলে সেকেণ্ডে কমপক্ষে সাত মাইল বেগে উপরের দিকে ছুটতে হবে। এই বেগকে বলা হয় পৃথিবীর প্রস্থান বেগ। ছোট বড়, ভারী অথবা হালকা, বস্তু যেমন হোক না কেন সেকেণ্ডে সাত মাইল বেগ নিয়ে উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করতে থাকলে পৃথিবী আর তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আজকাল রকেটকে ঐ

গতিবেগ দান করা হয়েছে বলে মানুষ চন্দ্রে অবতরণ করতে পেরেছে এবং গ্রহান্তরে যাত্রার স্বপ্ন দেখছে।

পৃথিবীর ঋতু বিভাগ

পৃথিবী যে উপবৃত্তাকার কক্ষ পথে সূর্য প্রদক্ষিণ করে সেই পথকে বলা হয় ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ। আপাত দৃষ্টিতে সূর্যকেই দেখা যায় আকাশ পরিক্রমা করতে। প্রাচীনকালের মানুষ ভাবতো, সূর্যই বুঝি প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে। তাই আকাশে সূর্যের ভ্রমণ পথকে রবিমার্গ নামে তাঁরা সেইদিনই চিহ্নিত করেছিলেন।

পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের পথটা উপবৃত্তাকার না হয়ে বৃত্তাকার হলে পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্বটা সব সময় নির্দিষ্ট থাকতো। উপবৃত্তাকার হওয়ার জন্য বছরের কোন কোন সময় সে সূর্যের বেশি কাছাকাছি হয়। যখন কাছাকাছি হয় তখন সূর্যের আলো ও তাপ অপেক্ষাকৃত বেশিই লাভ করে। ঋতু পরিবর্তনের এটি একটি সামান্য কারণ মাত্র। গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি কারণ আছে।

সূর্যের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর কেন্দ্র ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গের সমতলে অবস্থিত। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষ ক্রান্তিবৃত্তের উপর লম্বভাবে দাঁড়িয়ে নেই। একটু অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে, ক্রান্তিবৃত্ত ও পৃথিবীর অক্ষ ৯০ ডিগ্রি বা এক সমকোণে অবস্থান করছে না। একেবারে খাড়াভাবে থাকলে উভয়ের মধ্যে কোণের পরিমাণ হতো ৯০ ডিগ্রি। পৃথিবী একটু হেলান দিয়ে থাকার জন্য ক্রান্তিবৃত্তের উপর পৃথিবীর অক্ষ ৬৬½ ডিগ্রি কোণ করে আছে। পৃথিবী হেলান না দিয়ে সমকোণে থাকলে পৃথিবীর সব জায়গায় বছরের সব সময় আবহাওয়া নির্দিষ্ট থাকতো। অর্থাৎ নিরক্ষ অঞ্চলে চিরকাল বিরাজ করতো গ্রীষ্মকাল, মেরু অঞ্চলে সব সময় বিরাজ করতো প্রচণ্ড শীত এবং নিরক্ষ অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা থাকতো না। আসলে পৃথিবী ক্রান্তি-বৃত্তের উপর হেলান দিয়ে আছে বলেই পৃথিবীর সর্বত্র প্রতি বৎসর এমন ঋতু বৈচিত্র্য।

এই প্রসঙ্গে দিবারাত্রি, সন্ধ্যা-সকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা জানি, পৃথিবী আলো ও তাপ লাভ করে সূর্য থেকে। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল না হয়ে গোলাকার হওয়ার জন্য অর্থাৎ পৃথিবী নিজে

একটি গোলক হওয়ার জন্য সূর্যরশ্মি একই সময়ে তার অর্ধেকটা মাত্র আলোকিত করে। আলোকিত অর্ধাংশে হয় দিন এবং অন্ধকার অর্ধাংশে বিরাজ করে রাত্রি। রাত্রিতে আকাশে সূর্য থাকে না বলে দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রি বেশ শীতল। অন্যদিকে মধ্যাহ্ন অপেক্ষা ঊষা ও গোধূলিতে সূর্য থাকে দিগন্তের কাছাকাছি। তখন গরম ও ঠাণ্ডা কোনটিই বিশেষভাবে অনুভূত হয় না। সূর্য তখন আকাশে জেগে থাকা সত্ত্বেও কেন বেশি তাপ ও আলো আসে না?

পৃথিবীর উপরে আছে বায়ুমণ্ডল। তার বিস্তার শত শত মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত। সূর্যরশ্মিকে সব সময় সেই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে আসতে হয়। আর তখনই বায়ুস্তর কিছু কিছু সূর্যরশ্মিকে অর্থাৎ তাপ ও আলোকশক্তিকে শোষণ করে নেয়। মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য মাথার উপর থেকে লম্বভাবে কিরণ দেয় কিন্তু ঊষা ও গোধূলিতে সূর্যরশ্মি দিগন্ত থেকে তির্যকভাবে এসে পড়ে পৃথিবীর উপর। মধ্যাহ্নে সূর্যরশ্মি যত গভীর বায়ুস্তর ভেদ করে আসে, ঊষা কিংবা গোধূলিকালে আসে তার চেয়ে অনেক গভীর বায়ুস্তর ভেদ করে। তাই এই দুই সময়ে সূর্যরশ্মির বহুল পরিমাণই শোষিত হয়ে যায়। সকাল বেলার রোদ উক্ত কারণে মিষ্টি আর সূর্য দিগন্ত ছেড়ে যত উপরে ওঠে তত কম গভীর বায়ুস্তর ভেদ করতে হয় বলে ধীরে ধীরে সূর্য-তাপ অসহনীয় হয়ে ওঠে। পুনর্বার সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলান দিতে থাকলে আবার একটু একটু করে তাপ কমতে থাকে। ঐ একই কারণে নিরক্ষ অঞ্চল অপেক্ষা মেরুদেশ শীতল। নিরক্ষ অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে কিন্তু মেরুদেশে পড়ে তির্যকভাবে। লম্বভাবে পড়লে এক বর্গমিটার জায়গায় যে পরিমাণ সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়, তির্যকভাবে পড়লে সেই পরিমাণ সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হতে কয়েক বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এবার পূর্ব প্রসঙ্গেই আসা যাক। পৃথিবী যেহেতু ক্রান্তিবৃত্তের উপর ৬৬½ ডিগ্রি কোণ করে হেলান দিয়ে আছে, এই জন্য বিষুবরেখা ও ক্রান্তিবৃত্তের তল পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করেছে ২৩½ ডিগ্রি কোণ করে। ঐ কারণে সূর্যকে আমরা প্রতিদিন পূর্বদিকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উদয় হতে দেখি না। সূর্য বিশেষ একটি বিন্দু থেকে বছরে একবার ধীরে ধীরে উত্তরে সরে যায়। তারপর তিন মাস পরে ২৩½ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে এসে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে। আরও তিন মাস গত হওয়ার পর সূর্য আসে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুতে। এবার সে অগ্রসর হতে থাকে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণের গতিও থাকে তিন মাস। তারপর ২৩½ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে আসার পর আবার উত্তরমুখী হয়। নির্দিষ্ট বিন্দুটি

থেকে ২৩½ ডিগ্রি উত্তর কিংবা দক্ষিণ অক্ষাংশে গিয়ে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে সময় লাগে ৬ মাস। ঐ ৬ মাসকে ধরা হয় একটি অয়ন। গতি যখন উত্তর দিকে, অর্থাৎ মাঘ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত সময়কে বলা হয় উত্তরায়ণ এবং গতি যখন দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ শ্রাবণ থেকে পৌষ পর্যন্ত চলে সূর্যের দক্ষিণায়ন।

পূর্বে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর মাঝখান বরাবর যে বৃত্তটির কল্পনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় নিরক্ষবৃত্ত এবং নিরক্ষবৃত্ত থেকে ২৩½ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণে আরও দুটি বৃত্তের কল্পনা করা হয়েছে। উত্তরের বৃত্তটি কর্কটক্রান্তি এবং দক্ষিণের বৃত্তটি মকরক্রান্তি নামে পরিচিত। ২১শে মার্চ তারিখে সূর্যরশ্মি বিষুব বৃত্তের উপর লম্বভাবে এসে পড়ে। ঐ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্রই দিনরাত্রির দৈর্ঘ সমান সমান হয়। ২১শে মার্চের কিছু আগে থেকে পরবর্তী কিছুদিন পৃথিবীর সর্বত্রই শীত ও গ্রীষ্ম দু'য়ের কোনটিরই প্রাবল্য থাকে না। উত্তর গোলার্ধে তখন হয় বসন্তকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে বিরাজ করে শরৎকাল।

২১শে মার্চ তারিখের পর থেকে সূর্য নিরক্ষরেখা থেকে একটু একটু করে উত্তরে সরে যেতে আরম্ভ করে। তিন মাস পরে উত্তরে ২৩½ ডিগ্রি অক্ষাংশে এসে যায়। এখানে সূর্যের উত্তরায়ণও শেষ হয়। সেই দিনটি ২১শে জুন তারিখ। ২১শে জুন তারিখে সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। তখন উত্তর গোলার্ধে রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগ হয় অনেক বড়। আমাদের দেশে তখন দিবাভাগ বড় হয়ে ১৪ ঘণ্টার মত দাঁড়ায় এবং ইংলণ্ডে দিবাভাগ হয় ১৭ ঘণ্টার মত। জুন মাসে দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালের দৈর্ঘ কম বলে, দিনের বেলায় পৃথিবী যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে রাত্রিতে তার উপযুক্ত অনুপাতে তাপ বিকিরণ করতে পারে না। অনেকটা তাপ উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়। তাই উত্তর গোলার্ধের সর্বত্রই তখন বিরাজ করে গ্রীষ্মকাল। আর বিপরীত গোলার্ধে তখন বিরাজ করে শীতকাল।

২১শে জুনের পর সূর্য দক্ষিণ দিকে সরতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ ঐ দিন থেকে শুরু হয় সূর্যের দক্ষিণায়ন। ঠিক তিন মাস পরে ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে সূর্য পুনরায় নিরক্ষবৃত্তের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। পুনর্বার ঐ দিনটিতে পৃথিবীর সর্বত্রই দিবা রাত্রি সমান হয়ে যায়। গ্রীষ্ম এবং শীত কোন কিছুর প্রাবল্য থাকে না। উত্তর গোলার্ধে তখন আসে শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল।

২২শে সেপ্টেম্বরের তিন মাস পরে অর্থাৎ ২২শে ডিসেম্বর তারিখে অথবা পৌষের ৭ কিংবা ৮ তারিখে সূর্যরশ্মি নিরক্ষবৃত্ত থেকে ২৩½ ডিগ্রি দক্ষিণে

মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। উত্তর গোলার্ধে ঐ তারিখে দিবাভাগ হয় ছোট এবং রাত্রিকাল হয় বড়। আমাদের ঐ দিনে দিবাভাগের দৈর্ঘ মাত্র ১০ ঘণ্টার মত এবং ইংলণ্ডে হয় প্রায় ৭ ঘণ্টার মত। তাই উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র বিরাজ করে শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। ২২শে ডিসেম্বরের পর দিন থেকে পুনরায় সূর্য উত্তরে আসতে আরম্ভ করে এবং শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ণ। অর্থাৎ দিবাভাগের দৈর্ঘ ও সূর্য থেকে আগত রশ্মির ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে পতন-কোণের ওপর শীত/গ্রীষ্ম ভেদাভেদ নির্ভর করে।

পৃথিবী গোলাকার এবং তাকে মেরু অবলম্বনে ঘুরতে হচ্ছে, তদুপরি ক্রান্তি-বৃত্তের উপর সমকোণেও সে দাঁড়িয়ে নেই। এই সব কারণে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে দিন ও রাত্রির পরিমাণ সুদীর্ঘ। সেখানে ছমাস একটানা দিন এবং ছমাস একটানা রাত্রি বিরাজ করে। দিগন্ত ছেড়ে সূর্যকে উপরে উঠতে উঠতেই তিন মাস কেটে যায়। মেরুতে সূর্য কখনই মাথার উপর আসে না। দিগন্ত ছেড়ে একটু উপরে উঠে আবার পশ্চিমে হেলান দিয়ে পড়ে এবং অস্ত যেতেও তিন মাস লেগে যায়। উত্তর মেরুতে যখন দিন তখন দক্ষিণ মেরুতে হয় রাত্রি। মার্চ মাসে উত্তর মেরুতে সূর্যোদয় ঘটে আর দক্ষিণ মেরুতে নেমে আসে রাত্রি। পুনরায় ছ'মাস পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ মেরুতে ঘটে সূর্যোদয়। মেরু থেকে নিচের দিকের স্থানগুলির দিবারাত্রির দৈর্ঘ এতটা না হলেও বেশ সুদীর্ঘ। আর ঐ কারণেই মেরু থেকে বেশ কিছু দূরে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে কয়েকদিন ধরে বিরাজ করে উষা কিংবা গোধূলি।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঋতুর নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হলেও ঋতুকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই ঋতুগুলি হল গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত। প্রত্যেকটি ঋতুর স্থায়িত্ব তিন মাস কাল। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রীষ্মের শেষাশেষি সময়ে বর্ষা নামে এবং শীত পড়ি পড়ি করেও পড়তে দেরি হয়ে যায়। তাই গ্রীষ্মের পরে বর্ষা এবং শীতের পূর্বে হেমন্ত ঋতু বলা হয়। বাংলার ঋতু-চক্রে উক্ত কারণের জন্যই ৬টি ঋতুর স্থান। ঋতুগুলি যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

উত্তর গোলার্ধে ২১শে জুন তারিখে দিবাভাগ সবচেয়ে বড় হয় এবং ২২শে ডিসেম্বর তারিখে রাত্রি হয় বড়। এই দুই তারিখেই গ্রীষ্ম ও শীতের প্রাবল্য অনুভূত হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায়, গরমটা বেশি অনুভব করা যায় জুনের পরে। কারণ ২১শে মার্চ তারিখে দিন রাত্রি সমান হওয়ার জন্য পৃথিবী দিনের বেলায় যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে রাত্রিতে সেই পরিমাণ তাপই বিকিরণ

করে। দিবাভাগ যতই বড় হতে থাকে ততই তাপ ধীরে_ধীরে উদ্‌বৃত্ত হয়। অবশেষে ২১শে জুনের দিকে উদ্‌বৃত্ত তাপের পরিমাণ দাঁড়ায় সর্বাধিক। পরের দিকে রাত্রিভাগের পরিমাণ অল্প অল্প বাড়লেও পুনরায় দিন রাত্রি সমান না হওয়া পর্যন্ত তাপ উদ্‌বৃত্ত হতেই থাকে। তাই গ্রীষ্মের প্রাবল্য ২১শে জুনের পরেই অনুভূত হয় এবং একরকম আগষ্ট মাস পর্যন্ত চলে গ্রীষ্মকাল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আবার শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে গরমটা অসহ্য মনে হয়। তার মূলে উপরোক্ত কারণ তো আছেই তাছাড়া আছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণ। এই সময়টা বায়ু প্রায়ই জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আমাদের শরীর থেকে যে ঘাম নির্গত হয় তা তাড়াতাড়ি বাষ্পায়িত হতে পারে না। ঘামটা বাষ্পায়িত হতে পারলেই শরীর কিছুটা তাপ হারিয়ে স্বস্তি অনুভব করতো। আশ্বিন পর্যন্ত চলে একটানা জলীয় বাষ্পের প্রভাব। তাই আশ্বিন পর্যন্ত আমরা একটানা গুমোটকে সহ্য করি।

শীতের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। ডিসেম্বরে রাত্রিভাগ সুদীর্ঘ হলেও পরবর্তী জানুয়ারী মাসে আমরা শীত অনুভব করি বেশি। মাঘের অর্ধেকের পর দিবাভাগ যথেষ্ট বর্ধিত হওয়ায় ফাল্গুনের প্রথমের দিকে শীতের প্রাবল্য একেবারেই থাকে না। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়। আমরা তখন বলি বসন্ত এল।

পৃথিবীর ঋতুকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ না করে সাধারণভাবে বলা যায়, পৃথিবীর ঋতু মাত্র দুটি—গ্রীষ্ম ও শীত। গ্রীষ্মের শেষাংশে যখন গ্রীষ্মের প্রখরতা হ্রাস পায় তখন হয় শরৎ কাল এবং শীতের শেষে আসে বসন্ত। অথচ শরৎ ও বসন্ত এই দুটি ঋতুই আমাদের কাছে সমধিক প্রিয়। জলবায়ু ও আবহাওয়ার মতো অতটা না হলেও কোন একটি স্থানের ঋতু বৈশিষ্ট্য কিছুটা অন্তত সে স্থানের অক্ষাংশ, ভৌগলিক অবস্থান, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুমণ্ডলের চাপ ও সমুদ্র-জলের প্রবাহের ওপরও নির্ভর করে।

পৃথিবীর বয়স

বিজ্ঞানীদের ভাষায় গ্যাসীয় অগ্নিময় বিশাল আয়তনের এক গোলক থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সূর্যের। তারপর সূর্যদেহের বিচ্ছিন্ন বলয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে আমাদের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহদের। জন্মলগ্নে পৃথিবীও ছিল একটি

অগ্নিময় গোলক। তখন ছিল না তার এই রূপ। সেদিন যেন একটি জলন্ত পিণ্ড প্রচণ্ড গতিতে ঘুরপাক খেতে খেতে পরিভ্রমণ করছিল সূর্যের চারদিক। আজ এ কথা চিন্তা করতে গেলে অবাক হতে হয়, কেমন করে এবং কত দিনে সেই উত্তপ্ত দেহটা শীতল হয়ে সৃষ্টি হল এমন অপূর্ব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব ও উদ্ভিদ জগৎ ?

কাজটা কিন্তু এক আধ বছরে হয়নি। উত্তপ্ত দেহটা শীতল হতে ব্যয়িত হয়েছে কোটি কোটি বছর। তারপরেই জন্মলাভ করেছে আজকের এই শ্যামলা পৃথিবী। কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল ?

রূপকথার মত অদ্ভুত ও আশ্চর্য সেই পৃথিবীর অতীত কাহিনী। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, এমন কি সাধারণ মানুষকেও প্রলুব্ধ করে সে কাহিনী। সবার মন ছুটে যেতে চায় কোটি কোটি বছর আগে ফেলে আসা পৃথিবীর সেই অজ্ঞাত দিনগুলোর দিকে।

প্রথমেই মনে আসে, আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগেকার কথা বিজ্ঞানীরা জানলেন কেমন করে ? তাঁদেরই তো বিশ্বাস, পৃথিবীতে মানুষ এসেছে জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারায় একেবারে শেষের পর্যায়ে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল মানুষের আরণ্যক জীবন। পশুর মত মূক অবস্থায় কাটিয়েছে কত হাজার হাজার বছর। মনুষ্য সভ্যতা বলতে যা বোঝায়, সে তো মাত্র কয়েক হাজার বছরের। কোটি কোটি বছর আগেকার কথা কেমন করে সংগ্রহ করল মানুষ ?

সেই অতীতকথা কারও দ্বারা লিখিত কোন পুঁথিতে নেই। কেবল আছে অতীত দিনের কতকগুলি পাথর, জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় ধাতু রেডিয়াম। অতীতে পৃথিবী যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসেনি—তখন ঘন ঘন ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতো। তখনকার বহু জীব ও উদ্ভিদদেহ মাটির তলায় চাপা পড়ে আভ্যন্তরীণ চাপ ও তাপের প্রভাবে কোথাও কোথাও প্রস্তরীভূত হয়ে আছে। প্রস্তরীভূত জীব ও উদ্ভিদ দেহকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় জীবাশ্ম বা ফসিল। তাছাড়া সে যুগের বহু প্রাথমিক শিলা এখনও অবিকৃত অবস্থায় থেকে গেছে। অতীতের ইতিহাস উদ্ধার করার এগুলি বিজ্ঞানীদের এক একটি হাতিয়ার। কিন্তু এইসব হাতিয়ার থেকে পৃথিবীর বয়স সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। কিছুটা অনুমান করা যায় মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে ভূগর্ভে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় ধাতু রেডিয়াম থেকেই পৃথিবীর বয়স কতকটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

রেডিয়ামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে করতে একদিন সাধারণ সীসায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। কত বছরে কী পরিমাণ রেডিয়াম সীসাতে পরিণত হয়ে যায় সে হিসাবটা জানা হয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের। তাই রেডিয়ামের মধ্যে সীসার পরিমাণ দেখে তাঁরা নির্ণয় করেছেন পৃথিবীর বয়স। অবশ্য এই উপায়ে প্রাপ্ত পৃথিবীর বয়সের হিসাব সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে মহাকালের হিসাবে ঐ সামান্য ত্রুটিটার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

এখন একটা প্রশ্ন, ভূগর্ভে প্রাপ্ত রেডিয়ামের মধ্যে যে সীসা পাওয়া যায় সেটি যে মিশ্রিত অবস্থায় নেই—এমন কথা কেমন করে বলা যায়?

বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের মূলে একটি যুক্তি রেখেছেন। তাঁদের মতে, সাধারণ সীসা এবং রেডিয়ামের শেষ পরিণতিতে উৎপন্ন সীসা—এই দুই সীসার পারমাণবিক গুরুত্বের অল্প তফাৎ আছে। অর্থাৎ সাধারণ সীসার পারমাণবিক গুরুত্ব অপেক্ষা রেডিয়াম থেকে উৎপন্ন সীসার পারমাণবিক গুরুত্ব মাত্র এক বেশি। রেডিয়ামের অর্ধ আয়ুষ্কালের হিসেব ধরে বিজ্ঞানীরা যে হিসেব দাখিল করেছেন তা থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বয়স চারশ কোটি বছরেরও বেশ কিছু বেশি। পূর্বে জীবাশ্ম ও প্রাথমিক শিলার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা যে বয়স নির্ণয় করেছিলেন, সেটি ছিল তিনশ' কোটি বছরের মত।

শিলা ও মাটি

পৃথিবী যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিল সেদিন তার দেহের উপাদান হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতবকণা এবং কিছু কিছু তরল পদার্থ থাকলেও ঘনীভূত ও উত্তপ্ত গ্যাসীয় কণাও ছিল প্রচুর। সেদিন যত কঠিন ও ভারী কণা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কেন্দ্রের দিকে আর তাকে ঘিরে রেখেছিল প্রচুর গ্যাস। বহিরাবরণটিও ছিল ঘন গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ। সূর্য থেকে সদ্য সদ্য বিচ্যুত হওয়ার ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও ছিল অতি উচ্চ। এমন সেই তাপমাত্রা যে, তাতে বহু কঠিন পদার্থও ছিল গ্যাসীয় অবস্থায়। উক্ত কারণে সেদিন পৃথিবীর আয়তন ছিল আজকের পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় অনেক গুণে বড়। আকারটাও ছিল না কমলালেবুর মত। বিশেষজ্ঞদের মতে সেদিনের পৃথিবীর আকার ছিল অনেকটা ন্যাসপাতির মত। পৃথিবী তার মেরুদেশকে অবলম্বন করে ঘুরতে ঘুরতেই পরবর্তীকালে মেরুদ্বয় কিঞ্চিত ঢুকে পড়েছে ভেতরের দিকে।

সেই আদিম পৃথিবী একটি আবহমণ্ডলও লাভ করতে পেরেছিল। অর্থাৎ গ্যাস বলয়ে অবস্থানকারী বিভিন্ন সান্দ্র তরল ও ভারী গ্যাসীয় পদার্থ থেকে নির্গত হালকা গ্যাস পৃথিবীর সীমা ছেড়ে খুব বেশি দূরে এগিয়ে যেতে পারেনি। সম্ভবত এই আদি আবহমণ্ডলে ছিল মূলত অ্যামোনিয়া ও মিথেন ও স্বল্প পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা একত্রিত হয়ে যখন বিরাট পিণ্ডে পরিণত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লাভ করেছিল তখনই আশেপাশে পেয়েছিল জলীয় বাষ্প প্রভৃতিকেও। অপরপক্ষে আয়তনটা বিশাল হওয়ার জন্য বহু দূর থেকে অতি হাল্কা গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থকেও শোষণ করে এই আবহমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করে নিয়েছিল।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবী কাটিয়েছিল উত্তপ্ত অবস্থায়। আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্প যথেষ্ট থাকলেও পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত থাকার জন্য বৃষ্টিপাত হতে পারল না। আরও কেটে গেল কত লক্ষ লক্ষ বছর। পৃথিবীর উপরিভাগটা তাপ বিকিরণের ফলে ধীরে ধীরে শীতল হতে লাগল। কিন্তু অভ্যন্তরের তাপমাত্রা আদৌ হ্রাস পেল না। গরম দুধকে রেখে দিলে তার উপরে যেমন একটা শক্ত সর ভেসে ওঠে ঠিক সেইভাবেই পৃথিবীর উপরিভাগ শক্ত হয়ে উঠল এবং যত দিন গত হল, ততই সেই আস্তরণটা ক্রমে ক্রমে পুরু হল। তবুও পৃথিবীর অস্থিরতা কাটল না। বহু যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেবল উপরিভাগটাই অর্জন করল সুস্থিরতা। অভ্যন্তরের অস্থিরতা তেমনই বজায় থাকল। আভ্যন্তরীণ অস্থিরতার দরুণ উপরের কোন কোন স্থান বসে গেল, কোথাও বা ফাটল সৃষ্টি হয়ে সেই ফাটল পথে বেরিয়ে এল ভেতরের তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে উৎক্ষিপ্ত এই সমস্ত গ্যাস ও জলীয়বাষ্প আবহমণ্ডলকে আরও সম্পন্ন ও ভারী করে তুলল। আদি আবহমণ্ডলে প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে অ্যামোনিয়া ও মিথেনের প্রাধান্য থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের প্রাধান্যে চলে এসেছিল। স্থলদেশে পৃথিবীর উপরিভাগ এবার কোথাও হল নিচু এবং কোথাও হল উঁচু। অপরদিকে ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করতে করতে ঠাণ্ডা হওয়ায় উপরের আবহমণ্ডলও ঠাণ্ডা হল। জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের আকারে ভেসে উঠল পৃথিবীর আকাশে। তারপর আরম্ভ হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সে বৃষ্টি এক আধদিনে থামল না। মাসের পর মাস ঝরল অবিরামভাবে। মনে হয়, প্রথম দিকের সেই বৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারেনি পৃথিবী। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ অল্পদিনেই সমূহ জলকে বাষ্পাকারে পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছিল বায়ুমণ্ডলে। কিন্তু পৃথিবীর লাভ বড় কম হল না। ভূপৃষ্ঠে জল

সিঞ্চনের ফলে বেশ কিছুটা তাপ হারাল। কিছু জল ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে নেমে পড়ল অভ্যন্তরে। অভ্যন্তরে তাপমাত্রা অত্যন্ত অধিক থাকার জন্য যতটুকু জল প্রবেশ করল তার সবটুকুই বাষ্পে পরিণত হয়ে গেল। এবার সেই বাষ্প দিল চাপ। আরও অস্থির করে তুললো অভ্যন্তরকে। ফলে এখানে ওখানে সৃষ্টি হল অসংখ্য আগ্নেয়গিরির। যখন তখন শুরু হল ভূমিকম্প। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল ও গ্যাস বাহিরে বেরিয়ে এসে শীতল হল এবং রূপান্তরিত হল পাথর বা শিলায়। অন্যদিকে পুনরায় আকাশে জমা হল মেঘ। বছরের পর বছর ঝরল বারিধারা। জলে জলময় হয়ে গেল পৃথিবী। পৃথিবীতে বিগত ৩৮০ কোটি বছর ধরে তরল জলের অস্তিত্ব রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। এই জলের পরিমাণ কালে কালে সুনির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। আগ্নেয়গিরির সংখ্যাও বাড়ল। রাতদিন কেবল চললো অগ্ন্যুৎপাত আর অগ্ন্যুৎপাত। পৃথিবীর আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল গাঢ় ধোঁয়ায়। ঘন কুজ্মটিকার আবরণে মুখ ঢাকল পৃথিবী।

এই ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে পৃথিবীকে কাটাতে হয়েছিল প্রায় দেড়শ' কোটি বছর। সমগ্র পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে গেলেও কোথাও ছিল না মহাসমুদ্রের গভীরতা। ফলে সমূহ পৃথিবীপৃষ্ঠই দ্রুত তাপ হারানোর সুযোগ লাভ করল। ধ্বস নামল এখানে সেখানে। শীতল থেকে শীতলতর হওয়ায় পৃথিবীও হল সঙ্কুচিত। অভ্যন্তরস্থ পাথর—যেগুলি ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছিল, সেগুলি এবার পৃথিবীর সঙ্কোচনের ফলে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করল। এইভাবে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সৃষ্টি হল পাহাড়, পর্বত, গিরিখাত, হ্রদ, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র। পাহাড় পর্বত সৃষ্টি হওয়ার পরেই একরকম সেই প্রথম সৃষ্টি হল স্থলভাগের। স্থলভাগটা নাকি সে সময় আবার বিচ্ছিন্ন ছিল না এবং ব্যাপ্তিও ছিল না এত বিশাল। বস্তুত ২৫০ কোটি বছরের আগে পৃথিবীর পার্শ্বিক বিচলন ছিল অতি মন্থর। অন্যদিকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণ বন্ধ হল না—বরং বেড়েই চললো। স্থলভাগ তাতে বাড়তে লাগল একটু একটু করে।

প্রায় একশ কোটি বছরের প্রচেষ্টায় ভূত্বক প্রায় পনের বিশ মাইল গভীর পর্যন্ত শক্ত হয়ে গেল। ভূত্বকের উপাদান ছিল আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা। বিশেষজ্ঞদের মতে উপরোক্ত তিন রকমের শিলার প্রাথমিক রূপ আগ্নেয় শিলা। তাই আগ্নেয় শিলাকে অনেকে প্রাথমিক শিলা নামেও অভিহিত করে থাকেন। নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, ঐ প্রাথমিক

শিলা আদিম পৃথিবীর শক্ত হয়ে ওঠা পৃথিবীর বহিরাবরণ অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত লাভাস্রোত? অনেকে পরবর্তী কারণটার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়েছে।

আগ্নেয় শিলাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এক জাতীয় আগ্নেয় শিলার নাম গ্রীক পুরাণে উক্ত পাতাল পুরীর দেবতা প্লুটোর নামানুসারে প্লুটোনিক এবং অপর জাতীয় শিলাকে অগ্নিদেবতা ভলকানের নামানুসারে নামকরণ করেছেন ভলকানিক। সাধারণত গ্রানাইটকে বলা হয় প্লুটোনিক শিলা এবং ব্যাসল্টকে বলা হয় ভলকানিক শিলা। ব্যাসল্টে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ সিলিকা থাকে।

বিজ্ঞানীদের মতে আগ্নেয় শিলা বা প্রাথমিক শিলা দীর্ঘকাল নিজেকে অবিকৃত রাখতে পারেনি। সূর্যকিরণ, বারিধারা, জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে স্তরে স্তরে জমা হতে থাকে সমুদ্র-নদীর তলদেশে। কালক্রমে এই শিলাই স্তরীভূত পাললিক শিলায় পরিণত হয়েছে। আগ্নেয় শিলা থেকে পাললিক শিলার প্রযোজনার জন্য প্রয়োজন হয়েছে জলীয় বাষ্প ছাড়াও কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্যাসের।

পৃথিবীপৃষ্ঠে জলভাগ সৃষ্টি হওয়ার দরুণ প্রথমে জলে এসেছিল জীব। আদিম যুগের সেই সব জীবের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাদের প্রত্যেকের বহিরাবরণ রূপে ছিল শক্ত খোলস। সংখ্যায়ও তারা এসেছিল কোটি কোটি। মৃত্যুর পর তাদের দেহ সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়েছিল। তারপর চাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সেগুলি জমাট বেঁধে এক প্রকার শক্ত পাথরে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা এই ধরণের পাথরের নাম দিয়েছেন চুনাপাথর। অনেকের বিশ্বাস, আদিম স্তরের সেই সামুদ্রিক জীবগুলি সমুদ্রজলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থকে গ্রহণ করে গঠন করতো তাদের বহিরাবরণ।

সে আমলে প্রবাল নামেও এক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বাস করতো সমুদ্রে। সংখ্যায় তারা এত অধিক ছিল যে, তাদের দেহাবশেষ থেকে কালক্রমে সৃষ্টি হয়েছে প্রবালের পাহাড়। আজও তারা বাস করে সমুদ্রে এবং প্রবালের পাহাড়ও চোখে পড়ে।

আগ্নেয় শিলা এবং প্রাণীদেহ থেকে উৎপন্ন শিলা আভ্যন্তরীন চাপ ও তাপের প্রভাবে ও ভূগর্ভস্থ জলের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক জাতীয় পাথরে। ওদের বলা হয় রূপান্তরিত শিলা। সমুদ্রের তলদেশে যে

কাদা বা পলি জমে উঠল তাও অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারল না। কালক্রমে এরাও গঠন করল নতুন এক ধরনের পাথর। নাম হল শ্লেট পাথর। অপর দিকে চুনাপাথরও রূপ গ্রহণ করল মার্বেল পাথরের।

কোন কোন স্থানে পাললিক শিলার বেলে পাথর, চুনাপাথর প্রভৃতিকে বলা হয় পাললিক শিলা। সঙ্গে ফসিল বা জীবাশ্মও মিশে গেছে। কালক্রমে পাললিক শিলাও অন্য শিলায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যেমন বেলে পাথর থেকে উৎপন্ন হয়েছে কোয়ার্টজাইট। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, ভূত্বকটা গড়ে উঠেছে প্রায় সাড়ে আটশ' রকমের শিলা বা পাথর দিয়ে। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবীর আবরণ ওলট-পালট হয়ে গেলে নতুন নতুন শিলা দেখা যায়। শিলার আর এক ধরনের শ্রেণী-বিভাজন করা হয়েছে—মহাদেশিক ও সামুদ্রিক। মহাদেশিক শিলা ওজনে হালকা, এতে সিলিকা ও অ্যালুমিনার পরিমাণ বেশি। সামুদ্রিক শিলায় ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহের প্রাচুর্য, তা ওজনে ভারী।

পৃথিবীপৃষ্ঠ যে সব শিলা দিয়ে গঠিত তাতে বিভিন্ন প্রকার খনিজও স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে আবার শিলার শ্রেণী বিভাগ করেন শিলাতে আকরিকের উপাদান দেখে। যেখানকার শিলায় খনিজ পদার্থ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান সেই স্থানকে খনি বলে ধরা হয়। খনিজ পদার্থ আবার দুরকমের—ধাতব ও অধাতব। লোহা, তামা, সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতব খনিজ এবং কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি অধাতব খনিজ। যেখানে ধাতব খনিজ পাওয়া যায় সেখানকার শিলাতে ধাতু মৌলিক পদার্থ হিসাবে বিরাজ করে না। শিলাস্থ অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে যৌগিক হিসাবে অবস্থান করে। সেই কারণে একই ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন রকমের খনিজ পাওয়া যায়।

পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্রমবিকাশের ধারায় শিলারা স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে। কখনও কখনও শিলার উপর প্রচণ্ডভাবে চাপ পড়লে ভূগর্ভে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে চাপের ফলে শিলাস্তরে ফাটলও সৃষ্টি হয় এবং ফাটল বরাবর শিলা-স্তরের বিচ্যুতি ঘটে। এইসব কারণে ভূপৃষ্ঠ মাঝে মাঝে প্রবলভাবে কাঁপতে থাকে। তখন আমরা ভূমিকম্প বলি। চাপের ফলে শিলার মধ্যে আবার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত থাকে। ভূমিকম্পের মাধ্যমে সেই শক্তি পরবর্তী স্তরগুলিতেও সঞ্চারিত হয়। শিলাচ্যুতির ফলে এই যে ভূমিকম্প তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। ভূমিকম্পের আরো অন্যান্য কারণ থাকলেও শিলাচ্যুতির ফলে ভূমিকম্পই সবচেয়ে মারাত্মক। পার্বত্য অঞ্চলের ভূমিকম্প এই জাতীয় ভূমিকম্প, এবং বিশেষজ্ঞরা উক্ত ভূমিকম্পের নাম দিয়েছেন টেক্টনিক ভূমিকম্প।

এবার মাটি প্রসঙ্গে আসা যাক। মাটির সঙ্গে আমাদের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। মাটি আমাদের যোগায় খাদ্য, মাটি দিয়ে আমরা ঘর বানাই, মাটি দিয়ে আমরা পথঘাট প্রস্তুত করে থাকি। মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতি সবাই ভূমিষ্ঠ হয় মাটিতে আবার মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়াটাও শেষ পরিণতি। উদ্ভিদের বেলায়ও এই কথা খাটে। শিশু উদ্ভিদ প্রথম মাটি ফুটে উপরে ওঠে। মাটি থেকে খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করে একদিন ফুলে ফলে ভরে ওঠে। তারাই সরবরাহ করে আমাদের বেঁচে থাকার এবং সভ্যতার উপাদান। এক কথায় মাটি ছাড়া আমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হতো না।

এই মাটির সৃষ্টি কিন্তু শিলা থেকে। অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাই মৃত্তিকা। কিন্তু কেবলমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা বললে মাটির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা যায় না। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মাটি কতকগুলি যৌগিক সিলিকেটের সমষ্টি। শিলা থেকে মাটির জন্ম হলেও মাটির সঙ্গে শিলার পার্থক্য অনেকখানি। শিলাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করলে, এমনকি একেবারে মিহি গুঁড়ায় পরিণত করলেও মাটি পাওয়া যায় না। দেখা গেছে শিলাকে ধূলিকণার আকারে পরিবর্তিত করলেও মাটির মত জলকে ধরে রাখতে পারে না। মাটি যদি নৈসর্গিক কারণে কেবল ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাই হতো তাহলে আমরা চাষবাস করতে পারতাম না আর পারতাম না বাড়ীঘর বানাতে। তাই শিলা মাটির প্রাথমিক উপাদান হলেও শিলা থেকে মাটির উৎপত্তি হতে বহু বছর লেগে যায়। হাজার বছরেও এক মিলি মিটার পুরু মাটির আস্তরণ তৈরি হয় না।

মাটির উৎপত্তির মূলে আছে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা থেকে আগত খনিজ কণাদি, জৈব পদার্থসমূহের পচনক্রিয়া এবং জীবাণু জল ও বাতাসের ভূমিকা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্তিকাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। আস্থানিক মৃত্তিকা ও বাহিত মৃত্তিকা। আস্থানিক মৃত্তিকা মাটির প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে মাটি যে শিলা থেকে উৎপন্ন হয় সেই শিলারই উপর থেকে যায়। পরে জল, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য জায়গায় সঞ্চিত হয়। তখন তাকে বলা হয় বাহিত মৃত্তিকা। শিলার উপর দীর্ঘদিন ধরে তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ু, জল ও জীবাণুর ক্রিয়া চলার পরই উৎপন্ন হয় আস্থানিক মৃত্তিকা।

মাটির প্রধান প্রধান উপাদান সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কারবন, সিলিকন প্রভৃতি অধাতু। এর মধ্যে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহ সাধারণত প্রধান। শিলা থেকে মাটির জন্ম হলেও

মাটিতে সিলিকনের পরিমাণ মূল শিলা থেকে অনেক বেশি। অবশ্য শিলা ও মাটি উভয়েরই মধ্যে সিলিকন যৌগিক সিলিকেট রূপেই অবস্থান করে। সেই সিলিকেটের তফাৎও একটু আছে। মাটির সিলিকেটের কেলাস দ্বিমাত্রিক আর শিলার সিলিকেটের কেলাস ত্রিমাত্রিক।

উপরোক্ত অজৈব পদার্থগুলি ছাড়া মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কিছু কম নেই। প্রত্যেকটি জায়গার মাটিতে জীবাণুরা বাস করে। জীব ও উদ্ভিদের মৃতদেহ মাটিতে মিশলে যে পচন শুরু হয় তাতে কাজ করে ঐ জীবাণুরাই। ফলে উৎপন্ন হয় কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস এবং নানা জৈব অ্যাসিড। তাছাড়া মাটিতে থাকে হিউমাস নামে বিশেষ একটি উপাদান। উদ্ভিদের দেহ, তথা তার ফল-ফুল-পাতা-মূল-কাণ্ড এবং জীবজন্তুর দেহাবশেষ ও মলমূত্র মাটিতে মিশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করে হিউমাস। এই হিউমাস সব মাটিতে সমান থাকে না। যে মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ যত বেশি, সে মাটি তত উর্বর।

সাধারণভাবে মাটিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে থাকি। বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, দোঁআশ মাটি, কাদা মাটি, চুনা মাটি, পলি মাটি ইত্যাদি ইত্যাদি। বেলে মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকে এবং কাদার ভাগ থাকে নিতান্তই কম। অপর পক্ষে এঁটেল মাটিতে বালির ভাগ নগণ্য কিন্তু কাদার ভাগ থাকে যথেষ্ট। দোঁআশ মাটিতে কাদা ও বালির ভাগ প্রায় সমান সমান থাকে বলে—এই মাটি চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। ভৌত সংগঠন ও রাসায়নিক উপাদানের দিক থেকে মাটিকে অবশ্য তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—স্থানিক, অন্তর্স্থানিক ও আস্থানিক।

মাটির রঙ সাধারণত নির্ভর করে যে মূল শিলা বা পাথর থেকে মাটির সৃষ্টি হয়েছে—তারই খনিজের আধিক্যের উপর এবং মাটিতে অবস্থিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের পরিমাণের উপর। লৌহের আধিক্য থাকলে মাটি হয় লাল, চুনে সাদা, সিলিকার ভাগ বেশি থাকলে হয় হলুদ অথবা ধূসর এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকলে হয় কালো। তবে মিশ্র বর্ণের মাটি সচরাচর বেশি দেখা যায়। বলা বাহুল্য, নানা খনিজ পদার্থ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণের ফলেই মিশ্রবর্ণের মাটির উৎপত্তি হয়।

গভীরতা অনুযায়ী মাটির কতকগুলি স্তর দৃষ্ট হয়। ভূত্বকের সর্বনিম্ন স্তরে থাকে মূল পাথর। তার উপর ক্ষয়ীভূত প্রস্তরের স্তর। অতঃপর রাসায়নিক পদার্থে সমৃদ্ধস্তর এবং সবার উপরের স্তরটিই উদ্ভিজ্জ ও জৈব সার সমৃদ্ধ। প্রধানত এই উপরের স্তরটিকেই আমরা মাটি বলে থাকি।

জলবায়ু ভেদে বিভিন্ন দেশের মাটির গঠন ও প্রকৃতি আলাদা দেখা যায়। জলবায়ুর প্রভাবে এক এক দেশের বহু বিস্তীর্ণ স্থানের মৃত্তিকাকে বলা হয় মাণ্ডলিক বা মহাদেশীয় মৃত্তিকা। সেই সব মাটির এক একটি নামকরণও করেছেন বিজ্ঞানীরা। যেমন মরু অঞ্চলের হলুদ রঙের মাটিকে বলা হয় সিরোজেম, বৃষ্টিবহুল বনঅঞ্চলের লালবর্ণের মাটিকে বলা হয় পড্জল, নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমির কালো রঙের মাটিকে বলা হয় শারনোজেম ইত্যাদি। স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় আন্তঃ মহাদেশীয় মৃত্তিকা। যেমন সমুদ্র অথবা লবণাক্ত হ্রদের উপকূলে ক্ষার বা লবণাক্ত মাটি, জলাভূমির মাটি, নদীবাহিত পলিমাটি ইত্যাদি। শীতল ও আর্দ্র অঞ্চলের মাটিতে ক্ষারের পরিমাণ কম, অ্যাসিডের ভাগ বেশি। তা স্বাদে অম্লধর্মী।

অন্যদিকে আকর খনিজ অনুযায়ী মাটিকে মাত্র দুভাগে ভাগ করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম-লৌহময় মৃত্তিকা ও চুন জাতীয় মৃত্তিকা। অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহের পরিমাণ অধিক থাকার জন্য পড্জল, লোহিত ও ল্যাটেরাইট, তুন্দ্রা ও প্রেইরী বনভূমির মাটি-ই অ্যালুমিনিয়াম-লৌহময় মৃত্তিকা এবং চুনের আধিক্যের জন্য শারনোজেম, স্তেপস, সাভানা প্রভৃতির মাটি চুন জাতীয় মাটির উদাহরণ। এই শ্রেণীবিভাগ মহাদেশীয় মৃত্তিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপরের বিভাগগুলি ছাড়াও বিজ্ঞানীরা মাটিকে আরও বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে ভাগ করেছেন। মাটি ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে তার পরিমাণ বড় কম নয়। বর্তমানে আবার পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য গবেষণা আরও বেড়েছে। মাটির উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করার পর তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপাদান যোগ করে আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটির উর্বরতা বাড়ানো হচ্ছে। গবেষণা থেকে জানা গেছে, অঞ্চল ভেদে মাটিতে বহু জটিল জৈব যৌগ থাকে। অতিকায় অণুবিশিষ্ট জটিল যৌগ এবং বিভিন্ন ধরণের অ্যাসিডও বিদ্যমান। তাই মাটিকে কেবলমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা বললে ভুলই করা হবে।

শিলার মত মাটিরও ক্ষয় হয়। সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ ও বন্যা, অদক্ষ সেচব্যবস্থা ও অরক্ষিত নালা, অপরিকল্পিত কৃষি ও গাছপালা-ঘাসের দহন প্রভৃতিই মাটিকে ক্ষয় করে। মাটির ক্ষয় হওয়া কিন্তু আদৌ ভাল নয়। অপর-দিকে একমাত্র উদ্ভিদই পারে মাটির ক্ষয়কে বহুলাংশে রোধ করতে। তাই উদ্ভিদের প্রতি আমাদের সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সভ্য মানুষ অরণ্যকে নির্বাসিত করে যে অন্যায় করছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ক্ষয়প্রাপ্ত মাটিকে নদী পলির আকারে বহন করে আনে। সেই পলি নদীর তীরবর্তী ভূ-ভাগকে উর্বর করলেও ক্ষতি বড় কম করে না। আজকাল মানুষ জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত নদীর মুখে বাঁধ দিয়েছে। কিন্তু নদী-বাহিত পলিই করছে বিব্রত। এই পলি কলকাতাকে কী পরিমাণ সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেকথা সবারই জানা। পলি সমুদ্রের বুকে চর সৃষ্টি করে, নদীর মুখে জমা হতে হতে বদ্বীপ তৈরি করে। অপরদিকে কত সমৃদ্ধ জনপদকে যে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তারও হিসেব খুঁজে পাওয়া ভার। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে নদীবাহিত সর্বনাশা পলির জন্যই।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

বর্ণহীন গন্ধহীন স্বাদহীন যে গ্যাসীয় আবরণী পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে তাকেই আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীরই অংশবিশেষ এবং পৃথিবী নিজ অভিকর্ষবলের দ্বারা ওকে ধরে রেখেছে। তাইতো সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর বুকে জীবন—যা অপর কোন গ্রহে কিংবা উপগ্রহে আছে কিনা মানুষ আজও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি। অবশ্য জন্ম মুহূর্তে পৃথিবী এই বায়ুমণ্ডলকে বন্দী করে রাখতে পেরেছিল বলেই সে এমন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর।

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আড়াইশ' মাইল উপর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল। কারও কারও মতে এর বিস্তার আরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৬০০ মাইল পর্যন্ত। তবে সকলেই একমত যে, উপরের দিকে বায়ু ক্রমশ পাতলা হতে হতে ৩৭০ মাইলের পর গ্যাসের স্বাভাবিক ধর্ম হারিয়ে আরও উপরে একেবারে শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে, উপরের দিকে বায়ুর পরিমাণ যদিও কম তথাপি উপাদানগুলির বিশেষ পার্থক্য নেই। কেবল ত্রিশ মাইল উর্ধ্বে ওজোন নামক একটি গ্যাসের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় এবং আরও উপরের দিকে ওজোনের পরিমাণ অল্প অল্প করে বেড়ে যায়।

বায়ুকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে আছে শতকরা প্রায় ৭৮·০৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২০·৯৫ ভাগ অক্সিজেন, ০·০৪ থেকে সময় বিশেষে ৪ ভাগ পর্যন্ত জলীয় বাষ্প, ০·০৩ ভাগ কারবন ডাই অক্সাইড এবং ০·৯৩ ভাগ আর্গন। উপরোক্ত গ্যাসগুলি ছাড়াও আছে, কিছু পরিমাণ নিয়ন, হিলিয়াম, মিথেন,

জেনন, ক্রিপটন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য গ্যাস এবং স্বল্প পরিমাণ হাইড্রোজেনও কারবনিক অ্যাসিড গ্যাস।

আজকের দিনে আমরা প্রায় সবাই জেনে নিয়েছি, আমাদের চারদিকে রয়েছে বায়ু। এক কথায় বললে বলতে হয় যে, আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি। পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বত্রই বিরাজ করছে বায়ু। আমাদের সম্মুখে যে সব শূন্য পাত্র পড়ে থাকতে দেখি, সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে শূন্য মনে হলেও তার মধ্যে বায়ু আছে।

বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি বস্তুর উপর চাপ প্রদান করছে। সে চাপের পরিমাণ আবার অতি ভয়ঙ্কর। মাত্র এক বর্গফুট পরিমাণ জায়গার উপর বায়ু যে চাপ দেয় তার পরিমাণ প্রায় এক টনের কাছাকাছি। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির উপর সাড়ে চৌদ্দ টনের মত বায়ুর চাপ পড়ছে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমরা সতত সাড়ে চৌদ্দ টন বায়ুর বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি না কেন?

আমাদের শরীরের মধ্যেও আছে বায়ু এবং সে বায়ুও চাপ দিচ্ছে। তাই সমতা থাকায় আমরা বায়ুর ঐ ভয়ঙ্কর চাপটা অনুভব করতে পারছি না। তাছাড়া আমরা জন্মাবধি বায়ুচাপের মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত। যদি কোন মানুষকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বেশ কয়েক মাইল উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে তার নাক মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে সমূহ তথ্য একরকম বর্তমান কালের আবিষ্কার। প্রাচীন কালের মানুষ বুঝতে পারেনি যে, পৃথিবীর উপরিভাগে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুর একটা হালকা আবরণ আছে। মাত্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ যখন নিজের তৈরি বেলুনে চেপে ঊর্ধ্বাকাশে উঠল তখনই বুঝতে পারল বায়ুমণ্ডলের রহস্যটা। উপরের দিকে বায়ু যে ক্রমশ হালকা হয়ে গেছে এবং সেই বায়ুতে যে শ্বাসকার্য চালানো যায় না এই বিষয়ে প্রথম বোধহয় আলোকপাত করেছিলেন কক্সওয়েল ও গ্লাসিয়ার নামে দুজন বেলুন নির্মাতা। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে "বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্সের" পক্ষ থেকে তাঁরা বেলুনে চেপে সাত মাইল উপরে উঠেছিলেন। তখন কেউ সন্দেহ করেননি যে, উপরের বায়ুতে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হবে। অক্সিজেনকে বহন করার উপায়ও তখন আবিষ্কৃত হয়নি।

গ্লাসিয়ার ও কক্সওয়েল বেলুনে চেপে বেশ মনের সুখে উঠে যাচ্ছিলেন উপরে। হঠাৎ একসময় অস্বস্তি অনুভব করলেন। তারপর বেলুনটা যতই উপরে আরোহণ করতে লাগল ততই অস্বস্তি বৃদ্ধি পেল। অধিক উপরে

আরোহণ করা আর যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে বেলুনের গ্যাসকে বার করে দেওয়ার ছিপি খুলতে গিয়ে অবাক হলেন। ছিপি টানাটানি করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন সম্পূর্ণভাবে। ঠাণ্ডায় তখন তাঁদের হাতে ও পায়ের রক্ত জমে গিয়ে একেবারে অবশ হয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে একজন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অপর জন তখন দাঁত দিয়ে ছিপিটা খুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। অদৃষ্ট দেবতা সুপ্রসন্ন ছিলেন তাঁদের প্রতি। হঠাৎ খুলে গেল ছিপিটা আর তৎক্ষণাৎ গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বেলুন অবতরণ করতে আরম্ভ করল।

গ্ল্যাসিয়ার এবং কক্সওয়েল সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ছড়িয়ে পড়ল বিজ্ঞানী মহলে। প্রকৃতপক্ষে এতদিনেই বিজ্ঞানীরা গবেষণা আরম্ভ করলেন উপরের রায়ুস্তরকে নিয়ে। তবে হঠাৎ কেউ সাহসী হলেন না ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করতে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে টি ডি. বোর্ট নামে জনৈক ভূতত্ত্ববিদ নিজে বেলুনে করে আকাশে না উঠে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত বেলুনে কিছু যন্ত্রপাতি স্থাপন করে প্রেরণ করলেন ঊর্ধ্বাকাশে। তাঁর পরীক্ষার বিষয় ছিল, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় উষ্ণতার পরিমাপ করা। বোর্টই তাঁর পরীক্ষা থেকে প্রথম বুঝতে পারলেন, উপরের দিকে বায়ু ক্রমশ ঠাণ্ডা। কিন্তু সাত আট মাইল উপরে বায়ুর উষ্ণতা স্থির। তারপর আরও উপরের দিকে বায়ুর উষ্ণতা ধীরে ধীরে বাড়তে আরম্ভ করেছে।

বোর্ট তাঁর যুগান্তকারী মতামত প্রচার করলে বিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তবে হঠাৎ কেউ স্বীকার করে নিলেন না বোর্টের মতামত। কিন্তু ফল হল সুদূর প্রসারী। বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণার একরকম হিড়িক পড়ে গেল। অবশেষে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর স্থির হ'ল বোর্টের মতটাই অভ্রান্ত।

কিছুকাল পরে বিজ্ঞানীরা যখন অক্সিজেনের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন তখন দুঃসাহসিকরা অক্সিজেন গ্যাসের মুখোস পরে বেলুনের সাহায্যে আরোহণ করলেন ঊর্ধ্বাকাশে। ততদিনে বেলুনও হয়েছে অনেকখানি উন্নত। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে পিকার্ড এবং কিপ্‌ফার নামে দুজন অসমসাহসিক বেলুন নির্মাতা মাটি ছেড়ে প্রায় দশ মাইল উপরে উঠলেন। হঠাৎ একটা বিপদের সম্মুখীন হলেন তাঁরা। দেখলেন, বেলুনে গ্যাস নির্গমনের ছিপির সঙ্গে কতকগুলি দড়ি এসে জট পাকিয়ে ফেলেছে। দড়ির জট না খুললে ছিপি খোলা যাবে না আর মাটিতে অবতরণ করাও সম্ভব হবে না। তাই উভয়ে

সচেষ্ট হলেন জট খুলতে। কিন্তু হাজার টানাটানি করা সত্ত্বেও একখানা দড়িকে সরাতে পারলেন না। নিরূপায় হয়ে একরকম মৃত্যুর কোলে নিজেদের সঁপে দিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।

সূর্য অস্ত গেল। পিকার্ড ও কিপফার তখনও চেয়ে দেখছিলেন সেই দড়ির জটটাকে। এক সময় অবাক হলেন তাঁরা। যেন কোন যাদু মন্ত্র বলে আপনা হতেই আলগা হয়ে গেল দড়িগুলো। তারপর সবকটি দড়ির গাছা ছিপিকে ছেড়ে সরে গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন তাঁরা। তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন ছিপিটা। এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরে এল তাঁদের। বুঝতে পারলেন, আকাশে সূর্য না থাকায় ধীরে ধীরে বায়ু শীতল হল এবং বেলুনে আবদ্ধ গ্যাসও হল ঘনীভূত। তাতে বেলুনটা সঙ্কুচিত হওয়ায় দড়ির জট খুলে গেছে।

কথিত আছে বায়ুমণ্ডলের খবর সংগ্রহের জন্য ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মস্ত বড় এক বেলুনে চেপে মস্কো থেকে কয়েকজন বিজ্ঞানী আকাশের প্রায় দশ মাইল উর্ধ্বে উঠেছিলেন। দুর্ভাগ্য, জীবিতাবস্থায় তাঁদের একজনও কেউ ফিরে আসেননি। তাই তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা মানুষের অজানা থেকে গেছে। পরের বছর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে এন্ডারসন এবং স্টিভেনসন নামে দুজন বিজ্ঞানী তের মাইল উর্ধ্বে আরোহণ করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই প্রথম বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রদান করেন। বেতারের মাধ্যমে তাঁরা খবর পাঠিয়েছিলেন, তের মাইল উপরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে ৬২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেখান থেকে আকাশকে কালো দেখাচ্ছিল এবং চারদিকটা গাঢ় কুয়াশার আবরণে ঢেকে আছে বলে মনে হচ্ছিল। সেখান থেকে তাঁরা পৃথিবীর একটা ছবিও তুলেছিলেন। পৃথিবীপৃষ্ঠ যে গোলাকার এই সত্যটি প্রথম তাঁদের সেই ছবিতেই ফুটে উঠেছিল।

এনড়ারসন ও স্টিভেনসনের পরেও বহুজনে বেলুনের সাহায্য আকাশের বহু উপরে উঠেছিলেন। শোনা যায়, কেউ কেউ উঠেছিলেন চব্বিশ মাইলেরও উপরে। তাঁদের সবার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে এক রকম বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ভাগে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বায়ুমণ্ডলের প্রকৃত রহস্য। তবে একথাও সত্য যে, বায়ুমণ্ডলের চব্বিশ মাইল উর্ধ্বের খবর মানুষের হস্তগত হয়েছে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার প্রাক্কালে।

অপরদিকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজ্ঞানে উন্নত দেশসমূহ পৃথিবীর আবহমণ্ডল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে কতকগুলি রকেট উৎক্ষেপণ করেছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই এই উদ্দেশ্যে একটা সংস্থাও গঠন

করা হয়েছিল। ভারতবর্ষও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল এবং সেই সময়ই তৈরি হয়েছিল কেরালা রাজ্যে থুম্বা নামক স্থানের রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র।

সুদীর্ঘকালের শত শত বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে বায়ুমণ্ডলের প্রায় সমূহ তথ্য আজ প্রায় আবিষ্কৃত। আজ জানা গেছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৫০ ভাগের উপস্থিতি মাটি থেকে সাড়ে তিন মাইল উচ্চতার মধ্যে। শতকরা ৭৫ ভাগ অবস্থিত ৭ মাইলের মধ্যে, ১০ মাইল উচ্চতার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ও ১৭ মাইলের মধ্যে ৯৭ ভাগ। বায়ুমণ্ডলের যে অংশ আবহাওয়ার জন্য দায়ী তার বিস্তার দু মাইলের মতো, মোট জলীয় বাষ্পের অর্ধকেরও বেশি ৭৫০০ ফুট উচ্চতার মধ্যে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রধান তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। স্তরগুলির নাম যথাক্রমে ক্ষুব্ধস্তর বা ট্রোপোস্ফিয়ার, স্তব্ধস্তর বা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার। স্তব্ধস্তরকে কেউ কেউ শান্তস্তরও বলে থাকেন।

পৃথিবীর মেরুদেশ থেকে সাত মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত ক্ষুব্ধস্তরের বিস্তৃতি। বায়ু-মণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর এটি। এখানকার বায়ু সব সময় বিক্ষুব্ধ অবস্থায় আছে। এই স্তরে তাপমাত্রা সর্বত্র সমান নয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলে তৎসংলগ্ন বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উক্ত কারণে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অঞ্চলের তাপমাত্রাই সর্বাধিক। তারপর উপরের দিকে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করেছে। নিম্নাঞ্চলের বায়ু সাধারণ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে যে পরিমাণ শক্তি লাভ করছে তার চেয়েও বেশি শক্তি তাকে বর্জন করতে হচ্ছে শীতল হওয়ার জন্য। তাই ক্ষুব্ধস্তরের নিম্নাংশের বায়ুতে অবস্থিত গ্যাসগুলির ঘনত্বের তারতম্য ঘটছে অহরহ এবং একটি পরিচলনের স্রোত সৃষ্টি হচ্ছে আপনা হতেই। ফলে নিম্নভাগের গরম ও হালকা বায়ু উপরে উঠে যাচ্ছে এবং উপরের শীতল ও অপেক্ষাকৃত ভারী বায়ু নেমে আসছে নিচে। ঝড় ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতির উদ্ভব হচ্ছে এই কারণেই। মেঘ বৃষ্টি বজ্রপাত তুষারপাত ক্ষুব্ধস্তরেই ঘটে থাকে। ক্ষুব্ধস্তরটা শ' শ' মাইল বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের অতি সামান্য অংশ হলেও স্তরটি অন্যান্য স্তর অপেক্ষা যথেষ্ট ঘন।

পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুই আবার সর্বাধিক ঘন। উপরের দিকে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে এবং তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করেছে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তাপমাত্রা হ্রাসের পরিমাণ প্রতি মাইলে ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত। পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুর তাপমাত্রা

সাধারণত ৫০ ডিগ্রি থেকে ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। কিন্তু মাত্র তিন মাইল উর্ধ্বে তাপমাত্রা ০ ডিগ্রির নিচে নেমে গেছে। এই কারণের জন্যই উঁচু পর্বতের চূড়ায় জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে বরফের আকার প্রাপ্ত হয়েছে।

ক্ষুব্ধস্তরে সবসময় আলোড়ন চলার জন্য আমাদের সুবিধাও বড় কম হচ্ছে না। একদিকে আকাশে মেঘ জমছে এবং বৃষ্টির ফলে ধরণী হচ্ছে শস্যশ্যামল। অপরদিকে এই স্তরে বায়ুর প্রবাহ যদি না থেকে কেবল স্থির হয়ে থাকতো তাহলে পৃথিবীর আকর্ষণে বায়ুর ভারী উপাদান কারবন ডাইঅক্সাইড সরাসরি নেমে আসতো পৃথিবীপৃষ্ঠে। পৃথিবীর আবর্তন, ক্ষুব্ধস্তরের আলোড়ন এবং উষ্ণতার বৈষম্যের জন্য হালকা ও ভারী গ্যাসসমূহ এমনভাবে মিশে আছে যে, বায়ুতে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের পরিমাণের বিশেষ কোন তারতম্য হচ্ছে না। সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মিগুলির বেশির ভাগ বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য স্তর কর্তৃক শোষিত হলেও এই স্তরও তাদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিরোধ করে।

সাত মাইল থেকে চল্লিশ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত স্তরটিকে বলা হয় স্তব্ধস্তর বা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। উক্ত স্তরটিতে তাপমাত্রার পার্থক্য বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। এখানে ঝড়-বৃষ্টি, মেঘ-হাওয়া, বজ্রপাত-তুষারপাত, কোন কিছুই নেই। একেবারে শান্ত এই অঞ্চল। তাই সব সময় বিরাজ করছে অখণ্ড এক নীরবতা। তদুপরি সূর্যের আলোর প্রতিফলন নেই বলে স্তরটি ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অন্যদিকে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নিচে ৫৫ ডিগ্রিতে সব সময় স্থির হয়ে আছে। এত শীতল, এত নিস্তব্ধ এবং এত অন্ধকার যে আমরা কল্পনার মধ্যেও আনতে পারি না। যেন মৃত্যুর মত স্থির, নিষ্পন্দ ও ভয়ঙ্কর।

বর্তমানকালে বিজ্ঞানীরা আবার মনে করছেন, আপাতদৃষ্টিতে এই অঞ্চলকে একেবারে শান্ত বলে মনে হলেও চঞ্চলতা এখানেও কিছু কম নেই। মাত্র কিছুদূর পর্যন্ত তাপমাত্রা আছে স্থির, তারপর আবার বাড়তে আরম্ভ করেছে। কেউ কেউ আবার এমনও মনে করছেন, মাত্র পঁচিশ মাইল উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ফুটন্ত জলের কাছাকাছি। এই অঞ্চলেই ওজোন নামক এক প্রকার গ্যাস কিছুটা আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু একত্রিত হয়ে এক অণু ওজোনের সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু বেশি তাপমাত্রায় ওজোনের অণু ভেঙ্গে গিয়ে পুনরায় অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই এই অঞ্চলের অর্থাৎ স্তব্ধস্তরের উষ্ণতা খুব একটা বেশি হতে পারে না। উষ্ণতা বেশি হলে ওজোন কিছুতেই স্থায়ী হতে পারত না। বায়ুমণ্ডলের এই অঞ্চলেই ওজোনের ঘনত্ব সর্বাধিক।

স্তব্ধস্তর জীবের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক স্থান। এই স্তরে অক্সিজেনের পরিমাণ নিতান্ত কম তো বটেই বায়ুমণ্ডলের চাপও তেমন নেই। এত অল্প চাপ ও তাপমাত্রায় যে কোন পার্থিব জীবদেহ অসাড় হয়ে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া আছে মহাকাশ থেকে আগত শক্তিশালী ও মারাত্মক মহাজাগতিক রশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি, ইনফ্রারেড রশ্মি প্রভৃতির প্রভাব। সূর্য অথবা নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে আগত এই সমস্ত রশ্মির বেশ কিছু অংশ প্রবেশ করছে এই স্তরে। উর্ধ্বাকাশে সেই ওজোনের স্তরটাই বিশেষ ভাবে প্রতিহত করছে মারাত্মক রশ্মিগুলিকে। যার জন্য ওরা সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসতে পারছে না।

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তরটিকে বলা হয় আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার। চল্লিশ মাইল উর্ধ্ব থেকে আড়াইশ' মাইল পর্যন্ত এই স্তরের বিস্তৃতি। সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মিগুলি এবং ইলেকট্রনের স্রোত প্রবলবেগে প্রবেশ করছে এই স্তরে। ফলে ওরা আয়নমণ্ডলস্থিত বিরল বায়ুকণাকে সর্বদা আয়নিত করে চলেছে। এখানকার তাপমাত্রাও যথেষ্ট। বিজ্ঞানীদের মতে আয়নমণ্ডলও জীবের পক্ষে অতি মারাত্মক জায়গা।

বর্তমানে বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ এই স্তরটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অথচ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে একরকম কোন কিছু কারও জানা ছিল না। উক্ত স্তরটি সম্বন্ধে প্রথম যে সব বিজ্ঞানী গবেষণা আরম্ভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী গোয়েকল এবং বিজ্ঞানী ভিক্টর পি. এফ. হেস অন্যতম।

আকাশের বিদ্যুৎ এবং মেরু অঞ্চলের মেরুজ্যোতিকে দেখে এককালে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল, পৃথিবী সংলগ্ন জলীয় বাষ্প পৃথিবী থেকেই বিদ্যুৎ পরিবহন করে নিয়ে যাচ্ছে উর্ধ্বাকাশে। পরবর্তীকালে তেজস্ক্রিয় রশ্মি আবিষ্কারের পর এই ধারণার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা এবার মনে করলেন, পৃথিবীর মাটিতে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশে আছে সেইগুলির দেহ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডলকে করছে আয়নিত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে একবার কয়েকজন বিজ্ঞানী সমবেতভাবে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানের আয়নের পরিমাণ নির্ণয় করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন থিওডোর উলফ্ নামে জনৈক বিজ্ঞানী। তিনি প্যারিসের সুপ্রসিদ্ধ ইফেল টাওয়ারের উপর উঠে বেশ কিছুকাল ধরে গবেষণা চালালেন। একদিন তাঁর পরীক্ষায় ধরা পড়ল, ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা টাওয়ারের শীর্ষে বায়ুমণ্ডলে আয়নের

পরিমাণ কম। তখন সমস্ত বিজ্ঞানীদের মনেই এই রকমের ধারণা ছিল। কারণ, সবাই ধরে নিয়েছিলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন ভূপৃষ্ঠেই অবস্থান করছে তখন ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি স্থানেই আয়ননের পরিমাণ বেশি হবে। কিন্তু উল্‌ফ্‌ বিস্মিত হলেন অন্য কারণে। তিনি আগে থেকে অঙ্ক কষে ঠিক করে ফেলেছিলেন, টাওয়ারের শীর্ষে আয়ননের পরিমাণ কতখানি কম হবে! এখন বাস্তব পরীক্ষা থেকে দেখলেন, তাঁর অঙ্কের সঙ্গে একটা বড় রকমের গরমিল এসে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে আয়ননের মাত্রা ক্রমশ কমতে কমতে টাওয়ার শীর্ষে যত কম হওয়ার কথা ঠিক তত কম নয়। আয়ননের হার উপরে যেন যৎসামান্য বেড়েছে। উল্‌ফ্‌ কিন্তু এর কারণ আদৌ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না।

থিওডোর উল্‌ফ্‌-এর পরীক্ষা প্রভাবিত করেছিল সুইডেনের বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী গোয়েকলকে। তিনি স্বয়ংক্রিয় কিছু কিছু যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে একদিন আরোহণ করলেন বেলুনে এবং তেজস্ক্রিয়তা মাপতে মাপতে এগিয়ে গেলেন উপরের দিকে। মাত্র তিন মাইল উপরে ওঠার পর বিস্মিত হলেন তিনি। দেখলেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ একটু একটু করে কম হতে থাকলেও উপরের দিকে আবার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হলেন শেষ পর্যন্ত।

গোয়েকলের পরীক্ষার কথা ছড়িয়ে পড়ল বিজ্ঞানী মহলে। উৎসাহিত হয়ে পরীক্ষা করতে এগিয়ে এলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী হেস ছিলেন অন্যতম। গোয়েকলের মত তিনিও উঠলেন আকাশে। কিন্তু হেস তাঁর পরীক্ষাকে মাত্র তিন মাইল ঊর্ধ্বে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। আরও এগিয়ে গেলেন ঊর্ধ্বাকাশে। শেষে গোয়েকলের মতকে সমর্থন করে তিনি জানালেন, পৃথিবীর উপরের বায়ুস্তরে রয়েছে কতকগুলি ক্ষতিকারক রশ্মির প্রভাব। সেই রশ্মিগুলি মহাকাশ থেকে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। অথচ পৃথিবীর উপরিভাগের দুর্ভেদ্য বায়ুস্তর তাদের অবতরণ করতে বাধা প্রদান করছে।

হেসের কথায় সমগ্র পৃথিবীটাই যেন চমকে উঠল। যেখানে যত বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁরা সবাই এবার একযোগে আরম্ভ করলেন বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা পড়ল নানান তথ্য। সেই তথ্যগুলিকে একত্রিত করলে যা হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

মহাকাশ থেকে আগত অতি বেগুণী রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতি তরঙ্গাকারে প্রবেশ করছে বায়ুর ঊর্ধ্বস্তরে। তারা যখনই প্রবেশ করছে তখনই আয়নমণ্ডলের বিরল বায়ুকণা থেকে ইলেকট্রনকে বিচ্যুত করছে। ফলে ঊর্ধ্বের এই বায়ুস্তরে

পর্যাপ্ত পরিমাণে অবস্থান করছে পজিটিভ ও নেগেটিভ—এই দু ধরনেরই আয়ন। "আয়ন মণ্ডল" এই নামকরণের পেছনে আছে বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত।

আয়নমণ্ডল যে কোন জীবের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক স্থান। তথাপি এই স্তর পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদের নেহাৎ কম উপকার করছে না। সূর্য থেকে যে সব বিদ্যুৎ-চৌম্বক রশ্মি যথা মহাজাগতিক রশ্মি, অতি বেগুণী রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতি সরাসরি পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে তাদের বেশির ভাগই ব্যয়িত হচ্ছে বায়ুকে আয়নিত করার কাজে। কেবল বেতার রশ্মির কিছু অংশ, তাপ রশ্মি ও আলোক রশ্মিরাই আয়নমণ্ডল এবং তার পরবর্তী স্তরগুলিকে অতিক্রম করে নেমে আসছে পৃথিবীপৃষ্ঠে।

আয়নমণ্ডলকে আবার বিজ্ঞানীরা প্রধান চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। সেই স্তরগুলিকে তাঁরা সূচিত করেছেন কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর দিয়ে। আয়নমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরটিকে বলা হয় D স্তর। উক্ত স্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০ মাইল উপরে অবস্থিত এবং বিস্তৃতি ৭০ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয় E স্তরের বিস্তার উর্ধ্বে ৭০ মাইল থেকে ১২০ মাইল, তৃতীয় F_1 স্তর ১২০ মাইল থেকে ১৫০ মাইল এবং চতুর্থ F_2 স্তর ১৫০ মাইল থেকে ২৫০ মাইল উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরকে একই অক্ষর দিয়ে সূচিত করার কারণ, অনেক সময় এই দুটি স্তর এক সঙ্গে মিশে যায়। ওদের পৃথক কোন অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

সম্প্রতি আরও দুটি স্তরের কথা বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন। সে দুটি স্তরের নামকরণ করা হয়েছে G স্তর ও H স্তর। তবে F_1, F_2, G এবং H এই চারটি স্তরই সব সময় অশান্ত থাকে এবং আয়ননের পরিমাণও সর্বোচ্চ।

আয়নমণ্ডলের একটা বিশেষত্ব আছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গ ঐখানের স্তরগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে। তাই সম্ভব হয়েছে ঘরে বসে বেতার গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে দেশ বিদেশের খবর সংগ্রহ করা। আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণায় ভারতীয় বিজ্ঞানী ড. শিশির কুমার মিত্র ও ড. মেঘনাদ সাহার অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করার সময়ে ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বিভাজন প্রধানত তাপমাত্রার তারতম্যের ও আবহাওয়া সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং ওজনোস্ফিয়ার ও আয়নোস্ফিয়ার বিভাজন মূলত ভৌত-রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডল শুধু যে মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে তা নয়, শীত ও গ্রীষ্মের চূড়ান্ত তারতম্য থেকেও রক্ষা করে। সমাপ্তিতে বলা যায়, বায়ুমণ্ডলের মোট ওজন পরিমাপ করা গেছে, তা হল $৫\cdot৯ \times ১০^{১৫}$ টন।

পৃথিবীর বায়ু

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সভ্যতার উষালগ্নেই সে তার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল তার আশেপাশের বস্তু রাশির উপর। ভেবেছিল, এগুলি সবই বিশ্বপিতার মহান অবদান। কিন্তু এমন কিছু কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটতো—যা মানুষ কিছুতেই বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারত না। ঝড়, দাবানল, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি ছিল সেই সব ঘটনাগুলির অন্যতম। তাই এসব ক্ষেত্রেও ধরে নিয়েছিল অদৃশ্য কোন দানবীর শক্তিকে।

মানুষ সেদিন আরও অনুভব করেছিল, কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রবাহে গাছের পাতা নড়ে, ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়ায় ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীর জুড়িয়ে যায়, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁত কপাটি লাগে। সেই শক্তির প্রবাহ আবার মাঝে মাঝে অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তার প্রচণ্ড শক্তিতে বিধ্বস্ত হয় বনভূমি, বনস্পতিরা হয় ভূপতিত, বাসগৃহ হয় বিধ্বংস। মানুষ সেদিন অদৃশ্য ঐ শক্তি প্রবাহের নাম রেখেছিল বাতাস বা বায়ু। কল্পনা করেছিল, বাতাস একজন প্রবল পরাক্রমশালী দেবতা। যখনই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তখনই শুরু করেন দাপাদাপি। অতএব সেদিন এই রুদ্র দেবতার রোষ শান্তির ব্যবস্থা হয়েছিল, রচিত হয়েছিল মন্ত্র-পূজাপদ্ধতি-স্তবগাথা এবং কত কাল্পনিক কাহিনী।

বহুকাল ধরে মানুষ বায়ুকে দেবতা বলেই ধরে এসেছিল এবং বায়ু সম্বন্ধে কাল্পনিক কাহিনীগুলিকে নিয়েই ছিল তৃপ্ত। কিন্তু যতই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার হল, ততই মনের মধ্যে বায়ু সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উঁকি দিতে লাগল। কী এই বাতাস? তাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না, অথচ তার প্রবাহ অনুভব করি কেন? ওরা আসছেই বা কোথা থেকে?

প্রাচীন গ্রীকরা ছিলেন ভারী পণ্ডিত। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ অ্যারিস্টোট্‌ল ছিলেন গ্রীস দেশের লোক। বাতাস সম্বন্ধে তাঁর মনেও জেগেছিল কতকগুলি প্রশ্ন। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, বায়ু একটি মূল পদার্থ এবং এটি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছে পৃথিবীর সর্বত্রই।

অ্যারিস্টোট্‌ল বায়ু সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য কেবল করেননি আরও বলেছিলেন, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু চারটি মূল পদার্থ দিয়ে গড়া (কারও কারও মতে অ্যারিস্টোটলের পূর্বে এই মতবাদ গড়ে উঠেছিল)। সেই চারটি মূল

পদার্থ হল জল, বায়ু, মাটি ও আগুন। গ্রীক দার্শনিকরা আরও মনে করতেন, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুরাশি, এমনকি মানুষ, পশুপাখী, উদ্ভিদ প্রভৃতি সবার উপাদান ঐ জল, বায়ু, মাটি ও আগুন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষকেও বলা হতো জ্ঞানী-গুণীদের দেশ। এঁদের যাঁরা বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা করতেন তাঁরা উল্লেখ করলেন, বিশ্বজগতের মূল উপাদান চারটি নয় পাঁচটি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ এই পঞ্চভূতকে নিয়ে গঠিত হয়েছে সমস্ত বস্তু, উদ্ভিদ ও প্রাণী। অতএব ভারতীয় দার্শনিকদের মতেও বাতাস ছিল একটি মূল পদার্থ।

দার্শনিকদের দ্বারা প্রদত্ত তথ্যের উপর সেদিন আস্থা স্থাপন করেছিল সমগ্র পৃথিবীর মানুষ। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রবক্তা সত্যদ্রষ্টা ঋষি কিংবা প্লেটো, অ্যারিস্টোট্লের মত মহান দার্শনিকদের কথা কী মিথ্যে হতে পারে—ঠিক এই ধরনের একটি মনোভাব হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মনে ক্রিয়া করেছিল।

প্রায় দেড় হাজার বছর পরে ইউরোপে নবজাগরণের যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা বাতাসকে নিয়ে আরম্ভ করলেন পরীক্ষা। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট বয়েল নামে এক মহান বিজ্ঞানী বাতাসের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তবে আবিষ্কার তিনি বিশেষ কিছু করতে পারলেন না।

মিথ্যেই হোক, আর সত্যই হোক, সন্দেহ জিনিসটা বড় ভয়ানক। যদি কোন ক্রমে কোন সন্দেহ একবার মাথায় স্থান পায় তাহলে তাকে সহজে ঝেড়ে ফেলা যায় না। কেবল তাই নয়, সন্দেহ প্রভাবিতও করে অনেককে। তাই দেখা গেল, যাঁদেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাতাস একটি মূল পদার্থ, তাঁরাই হাতের কাছে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে গেলেন বাতাসকে নিয়ে পরীক্ষা করতে।

রবার্ট বয়েলের কিছু পরে অর্থাৎ ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন বেকর নামে এক বিজ্ঞানী বায়ু সম্বন্ধে না হলেও পঞ্চভূতের অন্যতম একটি উপাদান আগুন সম্বন্ধে একটি নতুন মতবাদ প্রচার করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকটি দাহ্য বস্তুর মধ্যে এমন একটি উপাদান আছে—যা বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে।

বেকরের মতকে সমর্থন করলেন ষ্টাল নামে আর একজন বিজ্ঞানী। প্রায় ত্রিশ বছর পরে অনেক ভেবেচিন্তে বেকরের মতকে প্রাধান্য দান করে এক নতুন মতবাদ প্রচার করলেন ষ্টাল। ষ্টাল প্রবর্তিত বিজ্ঞানে সে দিনের সেই মতবাদটির নাম "ফ্লোজিষ্টন বাদ"।

ফ্লোজিষ্টন শব্দটির অর্থ হচ্ছে অগ্নি উৎপাদক। গ্রীক ভাষায় ফ্লোক্স নামে একটি শব্দ আছে। ফ্লোক্সকে বাংলায় রূপান্তরিত করলে হয় অগ্নি-শিখা। ষ্টাল প্রচার করলেন, দাহ্য বস্তুর মধ্যে যে উপাদানটি জলতে সাহায্য করে তার নাম ফ্লোজিষ্টন। এই ফ্লোজিষ্টনকে আমরা দেখতে পাই না, এমনকি কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারি না! কেবল অগ্নিশিখার আকারে যখন পদার্থ থেকে নির্গত হয় তখনই তাকে আমরা দেখতে পাই।

ষ্টাল আরও প্রচার করলেন, ফ্লোজিষ্টনের পরিমাণ সব পদার্থে সমান থাকে না। কয়লা, তেল প্রভৃতি দাহ্য বস্তুতে এর পরিমাণ থাকে সর্বাধিক। সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থে ফ্লোজিষ্টন থাকে নামে মাত্র। কোন বস্তুকে পুড়িয়ে ফেললে যে অবশেষটুকু থাকে, ষ্টাল তার নাম রাখলেন ফ্লোজিষ্টন-হীন বস্তু—সাধারণ ভাবে যাকে আমরা ছাই বলি। তিনি মত প্রকাশ করলেন, ফ্লোজিষ্টন অপসারিত হওয়ার পর যে ফ্লোজিষ্টনহীন বস্তু বা ছাই পড়ে থাকে তার ওজন সর্বক্ষেত্রেই মূল বস্তু অপেক্ষা কম হবে।

ষ্টাল প্রবর্তিত মতবাদ সেদিন দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরা। এমন কি শীলের মত নামকরা বিজ্ঞানীও বাদ পড়লেন না। শীলের তখন খুব নাম ডাক। একদিন কী খেয়াল হল তাঁর! একটা কাচের পাত্রে কিছুটা সীসা নিয়ে খুব ভালভাবে পোড়ালেন। সীসাটা শেষ পর্যন্ত সীসাভস্মে পরিণত হল। তারপর কী ভেবে সীসাভস্মকে একটা বক যন্ত্রের মধ্যে পুরে পুনরায় উত্তপ্ত করলেন। এক সময় বুঝতে পারলেন শীলে, সীসা-ভস্মকে উত্তপ্ত করলে এক ধরনের গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসটিকে অবহেলা না করে উত্তপ্ত সীসাভস্ম থেকে সংগ্রহ করলেন সেই গ্যাস। তারপর এই নতুন গ্যাসটিকে নিয়ে শুরু করলেন নানা পরীক্ষা। নাকের কাছে ধরতে বুঝতে পারলেন উক্ত গ্যাসে শ্বাস গ্রহণ করতে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। গ্যাসপূর্ণ গ্যাস জারের মধ্যে একটুকরা লাল গনগনে কাঠ কয়লার আগুনকে রাখতে কয়লাটা উজ্জ্বল শিখায় জলে উঠল। আশ্চর্য বড় কম হলেন না তিনি। সীসাকে যেহেতু বাতাসে পুড়িয়ে সীসাভস্ম তৈরি করেছিলেন তাই বুঝতে পারলেন, গ্যাসটি এসেছে ঐ বায়ু থেকেই। তিনি ফ্লোজিষ্টন তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর ধারণা ছিল, বায়ু মূল পদার্থ ছাড়া কিছুই নয়। তাই ব্যাখ্যা করলেন, উক্ত গ্যাসটি বায়ুর একটি অংশ মাত্র। ভেবে চিন্তে একটা নামও রাখলেন। যেহেতু বায়ুর এই অংশটি জলতে সাহায্য করে তাই নাম দিলেন "ফায়ার বায়ু"। তিনি বায়ুর বিশেষ একটি উপাদান "অক্সিজেনকে" যে

আবিষ্কার করেছেন—সে কথা তাঁর মাথায় সেদিন আসেনি। সংস্কার এমন একটি জিনিস!

মহান বিজ্ঞানী শীলের পরীক্ষা কিন্তু ঐখানে থেমে যায়নি। আরও হরেক রকমের পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন বাতাসকে নিয়ে। একদিন একটা এক মুখ খোলা কাচ নলের মধ্যে চকচকে কয়েকখানা লোহার টুকরাকে রেখে উপুড় করে দিলেন একটি জলপূর্ণ বাটিতে। বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। শীলে দেখলেন, নলের মধ্যে বাটি থেকে বেশ কিছুটা জল উপরে উঠে গেছে। একটা স্কেল নিয়ে মেপে দেখলেন, নলের মধ্যে প্রায় এক পঞ্চমাংশ স্থান দখল করেছে জল।

বেশ ধীরে সুস্থে নলটিকে জলের বাটি থেকে সরিয়ে নিয়ে নলের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট বায়ুটাকে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন পরীক্ষা। এবার দেখলেন, বায়ুর এই অংশটির দ্বারা শ্বাসকার্য চালান যায় না। আগুনও জ্বলে না এর মধ্যে। মনে মনে একটু বিরক্তও হয়েছিলেন তিনি। ফায়ার বায়ুর বিপরীত ধর্ম লক্ষ্য করে পরম অবজ্ঞাভরে এটির নামকরণ করেছিলেন "ফাউল বায়ু"। শীলের এই ফাউল বায়ু যে বায়ুর আর একটি উপাদান নাইট্রোজেন—একথা আজ আমরা বুঝতে পারলেও সেদিন শীলে ধরতে পারেননি। তিনি স্থির করেছিলেন, বায়ুর এক অংশ জ্বলতে সাহায্য করে, অপর অংশ তা পারে না। তবে তাঁর সিদ্ধান্তকে তিনি ঘোষণা করেননি। কেবল তাঁর পরীক্ষার ফলাফলটা জানিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানীদের।

শীলের পরীক্ষাগুলি অনুপ্রাণিত করেছিল তৎকালীন আর একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী প্রিষ্টলিকে। বার বার তিনি পরীক্ষাগুলি হাতে-নাতে করে দেখলেন। শেষে সীসার বদলে ব্যবহার করলেন পারদকে। পারদকে পুড়িয়ে পারদভস্ম তৈরি করার পর সেই পারদভস্মকে পুনরায় গরম করে লাভ করলেন শীলের সেই ফায়ার বায়ু। অতঃপর ঘোষণা করলেন, শীলের পরীক্ষার মধ্যে ত্রুটি নেই। শীলের মত তখন তাঁরও ধারণা হল, বায়ু মূল পদার্থ হলেও বায়ু দুরকমের। একটি ফায়ার বায়ু এবং অপরটি ফাউল বায়ু।

শীলের ফায়ার বায়ুকে নিয়ে প্রিস্টলি আরও একটি পরীক্ষা করেছিলেন। দুটি গ্যাস জারের একটিতে রেখেছিলেন ফায়ার বায়ু এবং অপরটিতে ফাউল বায়ু। অতঃপর দুটি ছোট ছোট ইঁদুরকে গ্যাস জার দ্বয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখলেন, ফাউল বায়ুতে রাখা ইঁদুরটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করতে করতে মারা গেল আর ফায়ার বায়ুতে রাখা ইঁদুরটিকে মরতে অনেক সময় লেগে গেল।

প্রিস্টলির বুঝতে অসুবিধা হল না যে, জীবের শ্বাসকার্যের জন্য ফায়ার বায়ু অপরিহার্য। পরীক্ষার দ্বারা তিনি আরও স্থির করেছিলেন, বায়ুতে ফায়ার বায়ুর পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে মূল বায়ুর এক পঞ্চমাংশ। কিন্তু শীলের মত তিনিও ছিলেন বাতাসের মৌলিকত্বে বিশ্বাসী এবং ফ্লোজিষ্টন তত্ত্বের সমর্থক। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, বাতাসের পাঁচভাগের মধ্যে চারভাগই ফ্লোজিষ্টনহীন। যখন কোন জ্বলন্ত বস্তুকে বায়ুর সান্নিধ্যে আনা হয় তখন ঐ জ্বলন্ত বস্তু থেকে কেবলমাত্র ফায়ার বায়ুই দ্রুত ফ্লোজিষ্টন গ্রহণ করে। ফলে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে জ্বলন্ত বস্তু। সেই থেকে তাঁর আর একটা ধারণা হল, আগুন জ্বালানোর ফলে অহরহ বাতাস ফ্লোজিষ্টনকে গ্রহণ করছে। উদ্ভিদ সেই ফ্লোজিষ্টনকে শোষণ করে শুদ্ধ করে দিচ্ছে বাতাসকে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি আজকের দিনে হাস্যকর মনে হলেও সেদিন বিজ্ঞানীরা কিন্তু কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

ঠিক সেই সময় প্যারাসেলসাস নামে একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে লোহার গুঁড়ার বিক্রিয়া ঘটিয়ে আকস্মিকভাবে প্রস্তুত করলেন বিশেষ এক ধরনের গ্যাসকে। পরীক্ষা করতে দেখা গেল, গ্যাসটি অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না অথচ নিজেই বর্ণহীন শিখায় জ্বলে ওঠে। ক্যাভেণ্ডিস নামে আর একজন রসায়নবিজ্ঞানী প্যারাসেলসাস আবিষ্কৃত গ্যাস এবং শীলে ও প্রিস্টলির ফায়ার বায়ু ও ফাউল বায়ুকে নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠলেন। প্যারাসেলসাস আবিষ্কৃত গ্যাসটি অবশ্য হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তবু সে যুগের বিজ্ঞানীদের কাছে হাইড্রোজেন একরকম অজ্ঞাত থাকার জন্য নানা জনে নানা ভাবে গ্যাসটিকে নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। শেষে ক্যাভেণ্ডিস উক্ত গ্যাসের দুভাগ ও ফায়ার বায়ুর একভাগ এক সঙ্গে মিশিয়ে এবং সেই মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে তৈরি করে ফেললেন জল।

প্রিষ্টলি শুনতে পেলেন ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার কথা। মন্তব্য করলেন, লোহার গুঁড়া এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসে থাকে প্রচুর ফ্লোজিষ্টন। যেহেতু ক্যাভেণ্ডিস উক্ত গ্যাস ও ফায়ার বায়ুর মধ্যে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে জল তৈরি করেছেন তাই প্যারাসেলসাসের গ্যাসটির নামকরণ করলেন ফ্লোজিষ্টন পূর্ণ জল এবং ফায়ার বায়ু তথা অক্সিজেনের নামকরণ করলেন ফ্লোজিষ্ট হীন জল। ক্যাভেণ্ডিসও ফ্লোজিষ্টন তত্ত্ব থেকে দূরে ছিলেন না। তাই অম্লান বদনে মেনে নিলেন প্রিষ্টলির কথা।

এক রকম দেড়শ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল ঐ ফ্লোজিষ্টন ভূতটা। শীলে ও প্রিষ্টলি আবিষ্কৃত ফায়ার বায়ু ও ফাউল বায়ু যে বাতাসের

দুটি উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন—একথা কেউ ভরসা করে বলতে পারেন নি। কেবল কতকগুলি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছিল। তাই তখনও মানুষ নিশ্চিত ছিল যে, বাতাস অবশ্যই মূল পদার্থ, কেবল ঐ ফ্লোজিষ্টনের জন্যই ব্যাপারগুলো ঘটে থাকে। এর পর ল্যাভয়সিয়ার বসলেন হাতের কাছে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে। শীলে, প্রিষ্টলি, প্যারাসেলসাস এমনকি ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষাগুলোও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখলেন। তারপর কী ভেবে বস্তু ও বস্তুভস্ম উভয়কে তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখলেন। এবার বড় আশ্চর্য বোধ করলেন তিনি। ধাতু ও ধাতুভস্মের ওজন নিয়ে দেখলেন, প্রতি ক্ষেত্রে ধাতু অপেক্ষা ধাতুভস্মের ওজন বেশি হচ্ছে।

সীসা ও পারদ ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটা ধাতুকে পোড়ালেন। পোড়ালেন লোহা এবং ম্যাগনেসিয়াম। সর্বক্ষেত্রে দেখলেন ধাতুভস্মের ওজন বেশি। ফ্লোজিষ্টন তত্ত্ব এবার মাথায় উঠল তাঁর। হিসেব করে দেখলেন, পারদ প্রভৃতিকে বায়ুতে পোড়ালে যে পরিমাণ বায়ু ব্যয়িত হয় ঠিক সেই পরিমাণ বায়ু ফেরৎ পাওয়া যায় তাদের ভস্মকে পুনরায় উত্তপ্ত করলে। এবার ল্যাভয়সিয়ার সিদ্ধান্তে এলেন, ফ্লোজিষ্টন তত্ত্ব একেবারেই ভুল এবং বাতাসও মূল পদার্থ নয়। সেই প্রথম তিনি পৃথিবীকে শোনালেন, বায়ু মিশ্র পদার্থ। বায়ুকে বিশ্লেষণ করলে দুটি গ্যাস পাওয়া যায়। একটির নাম অক্সিজেন—যা জীবের শ্বাস কার্যের জন্য ও দহন কার্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অপরটি নাইট্রোজেন—যা কোন কাজে লাগে না অথচ বাতাসে ওর পরিমাণটাই সবচেয়ে বেশি। ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষাটিকেও ব্যাখ্যা করলেন তিনি। বললেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনেই জলের উৎপত্তি হয়। যদিও অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি নামকরণগুলি ল্যাভয়সিয়ারের দ্বারা হয়নি।

বায়ুর মূল উপাদানগুলির আবিষ্কর্তা ল্যাভয়সিয়ার না হলেও তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, বায়ু মৌলিক পদার্থ নয়। দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে এতদিনে বিজ্ঞান খুঁজে পেল তার নিজের পথ। সব দেশের বিজ্ঞানীরা এবার মত্ত হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানকে সঠিক পথের সন্ধান দান করতে। তারই ফলস্বরূপ অতি অল্পকালের মধ্যে আবিষ্কৃত হল বায়ুর অন্যান্য উপাদান। নিঃসন্দেহ হল মানুষ, বাতাস অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কারবন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতির মিশ্রণ—এটি আদৌ মৌলিক পদার্থ নয়।

বায়ুর অন্যতম উপাদান নাইট্রোজেন

বায়ু সম্বন্ধে আলোচনাকালে নাইট্রোজেনের আবিষ্কারের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিনের কোন বিজ্ঞানী বাতাসের এই উপাদানটির প্রতি আদৌ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এমন কি ল্যাভয়সিয়ারের মত বিজ্ঞানীরও উক্ত গ্যাসটির প্রতি ছিল তাচ্ছিল্যের মনোভাব। তিনিই শীলের ফাউল বায়ুর পরিবর্তে নামকরণ করেছিলেন অ্যাজোট। শব্দটি ল্যাভয়সিয়ার চয়ন করে-ছিলেন ফরাসী ভাষা থেকে। অ্যাজোট শব্দের অর্থ নিষ্প্রাণ। অর্থাৎ তিনি ধরে নিয়েছিলেন, গ্যাসটি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চ্যাপটাল নামে আর একজন ফরাসী বিজ্ঞানী সোরা বা নাইটারের মধ্যে এক ধরনের গ্যাসের সন্ধান লাভ করেন। গ্যাসটি সংগ্রহের পর দেখলেন, ল্যাভয়সিয়ারের অ্যাজোট আর শীলের ফাউল বায়ুর সঙ্গে আছে সর্বাংশে মিল। তখনই বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলেন, গ্যাসটির নাম অ্যাজোট অথবা ফাউল বায়ু কোনটিই হওয়া উচিত নয়। যেহেতু এটি নাইটারের একটি উপাদান, অপরদিকে গ্যাসটি নাইটারকে উৎপন্ন করতে পারে —এই কারণে নাম রাখা হল "নাইট্রোজেন" বা নাইটার উৎপাদক।

সেদিন নাইট্রোজেনের প্রতি বিজ্ঞানীদের সে কী অবজ্ঞা! স্বাদহীন, বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। বাতাসের চেয়ে অল্প হালকা। জলে দ্রবীভূত হয় না ভাল-ভাবে। নিজে জ্বলে না, অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না। শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজন হয় না আদৌ। বিষাক্ত যদিও নয়, তবু এই গ্যাসের পরিবেশে জীব বাঁচতে পারে না। ওকে ঠাণ্ডা করলে সহজে তরলে পরিণত হয় না। অত্যধিক শীতল করলে প্রথমে তরল ও পরে সাদা কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রাসায়নিক ক্রিয়াও করে না বড় একটা কারুর সঙ্গে। এহেন নিষ্ক্রিয় গ্যাস কোন্ কাজে লাগবে মানুষের?

কিন্তু যে বিজ্ঞানীরা একদিন তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন, সেই বিজ্ঞানীরাই আবার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন নাইট্রোজেন প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে যে উপকারটুকু করছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরের দিকে তাঁরা এমনও মন্তব্য করলেন, এই নাইট্রোজেনের জন্যই সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর বুকে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগৎ। বিজ্ঞানীরা মনে

করছেন, যে অ্যামিনো অ্যাসিড পৃথিবীর জীবনের উৎস স্বরূপ—সেই অ্যামিনো অ্যাসিডের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন পরোক্ষ-ভাবে কত যে উপকার করছে তা নিম্নের আলোচনা থেকে সহজে বুঝতে পারা যাবে।

বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস অবশ্য আবিষ্কার করেছিলেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে এক রকমের যৌগিক গ্যাস উৎপন্ন করে। ঐ গ্যাসটি যে কী, অথবা অন্য কোন মৌলিক গ্যাসের সঙ্গে কোন বিশেষ পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে নাইট্রোজেন ক্রিয়া করে কি না—এসব বিষয়ে তিনি আদৌ আলোকপাত করেন নি। অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও একরকম নীরব ছিলেন দীর্ঘকাল। শেষে এই বিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন, নাইট্রোজেন যতই নিষ্ক্রিয় হোক না কেন, যে কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবন-ধারণের মূলে আছে ওর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান। বিজ্ঞানীদের মতে জীব ও উদ্ভিদের একান্ত অপরিহার্য খাদ্যোপাদান প্রোটিন নামক জটিল যৌগটি নাইট্রোজেন ব্যতীত উৎপন্ন হতে পারে না।

জীবনের উৎস, জীব ও উদ্ভিদের খাদ্যোপাদানের কথা বাদ দিলেও বাতাসে নাইট্রোজেনের উপস্থিতি আমাদের নানাদিক থেকে উপকার করছে। বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ পাঁচভাগের চারভাগ। ল্যাভয়সিয়ার সেদিন বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, কোন যৌক্তিকতা নেই বাতাসের এই অপ্রয়োজনীয় বিশাল নাইট্রোজেন ভাণ্ডারের। এখন বিজ্ঞানীরা সে কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন না। তাঁরা মনে করেন, বাতাসে পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকার জন্য অক্সিজেনকে পাতলা করে রেখেছে। বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম হয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি হলে জীবের শ্বাসকার্য আরও দ্রুত নিষ্পন্ন হতো এবং অল্পদিনেই জীবের আয়ু যেত ফুরিয়ে। কোন খাদ্যের দ্বারা সম্ভব হতো না শরীরের সে ক্ষয়কে রোধ করা। বিশ ত্রিশ বছরের পরমায়ু লাভ করে মানুষ কিছুই করতে পারত না। এমন কি বিবর্তনের ধারায় মানুষ পৃথিবীতে আসতো কিনা সন্দেহ।

অপরদিকে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ যদি নাইট্রোজেনের মতই হতো তাহলে জীবের আয়ু আরও কম হতো এবং কোথাও আগুন জ্বললে সে আগুনকে আয়ত্তে আনা যেত না। আগুনের শিখা হতো আরও উজ্জ্বল। দাবানল ছুটে এসে নগরকে স্পর্শ করতো। এক কথায় আগুন জ্বালানই হতো বিপজ্জনক। অপরদিকে দহনের ফলে যে পরিমাণ কারবন ডাই অক্সাইড

উৎপন্ন হতো তাকে শুদ্ধ করা উদ্ভিদের দ্বারা সম্ভব হতো না। ফলে কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেড়ে চলতো। সত্য বলতে কি, বাতাস যদি চার ভাগ নাইট্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেনের মিশ্রণ না হতো তাহলে পৃথিবীতে এই ধরনের জীব ও উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি হতো না।

সাম্প্রতিককালে জীবদেহে নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নতুন নতুন কথা শোনা যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের অনেকেই বলতে চাইছেন, বাতাসের নাই-ট্রোজেন কেবলমাত্র প্রোটিন উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে না, জীব তার জীবদ্দশায় প্রতি মুহূর্তেই গ্রহণ করছে নাইট্রোজেনকে। অর্থাৎ অক্সিজেনের মত নাইট্রোজেন ও জীবের জীবনধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

উপরোক্ত মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে আছেন ভলস্কি নামে জনৈক-সোভিয়েত বিজ্ঞানী। কথিত আছে, তিনি নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও বাতাসের নাইট্রোজেন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং একজন চিকিৎসকের সঙ্গে মিলিত হয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করার পর বিজ্ঞানীদের সম্মুখে তুলে ধরেন প্রায় অবিশ্বাস্য কতকগুলি তথ্য। তাঁর তথ্যগুলির মধ্যে যেটি সর্বাগ্রে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি হল, প্রাণীরা নাকি জীবন ধারণের জন্য বায়ু থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করে থাকে—যেমন উদ্ভিদেরা সরাসরি কারবন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে খাদ্য তৈরির জন্য। কিন্তু প্রাণীরা আদৌ টের পাচ্ছে না

ভলস্কি হাতে নাতে কতকগুলো পরীক্ষা করে উপরোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে তাঁর পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল কয়েকটা মুরগির ডিম। আমরা জানি, ডিমের বহির্ভাগ শক্ত আবরণে আচ্ছাদিত বলে ভেতরের ভ্রূণ বাহির থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। ভলস্কি পরীক্ষা করে দেখলেন, একটা টাটকা ডিমের মধ্যে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর তার মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনেকখানি কমে যায়।

ভলস্কি তাঁর মতবাদটি প্রচার করতে গেলে চারদিক থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তিনি। সর্বসমক্ষে তিনি উপরোক্ত পরীক্ষাটি হাতেনাতে করে দেখিয়েছিলেন। পরে একটি ডিমকে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন যুক্ত বাতাসের মধ্যে রেখে আরও দেখিয়ে ছিলেন, ডিমের মধ্যে আপনা হতেই তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ভলস্কি তাঁর পরীক্ষাগুলিকে কেবলমাত্র ডিমের উপর প্রয়োগ করে নিশ্চিন্ত

হননি অপরাপর কয়েকটি প্রাণীর উপরও প্রয়োগ করেছিলেন। কথিত আছে, আপন সিদ্ধান্তকে যাচাই করার জন্য "সোভিয়েত মহাকাশ গবেষণা সংস্থার" সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। প্রথম প্রথম সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করতেন তাতে মানুষের পরিবর্তে মনুষ্যেতর জীবকে পাঠান হতো। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে স্থাপন করা হতো বিশেষ একটি প্রকোষ্ঠ। ঐ প্রকোষ্ঠটিতে ছেড়ে দেওয়া হতো কতকগুলি প্রাণীকে। আর জীবদেহের স্বাভাবিক কাজকর্ম যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য প্রকোষ্ঠে থাকতো পার্থিব আবহাওয়া। ভলস্কি একবার কোন একটি কৃত্রিম উপগ্রহের প্রকোষ্ঠে পার্থিব আবহাওয়ার পরিবর্তে কেবলমাত্র অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ রেখে ছেড়ে দিয়েছিলেন কয়েকটি প্রাণীকে।

মহাকাশ পরিক্রমা করে কিছুদিন পরে কৃত্রিম উপগ্রহটি ফিরে এল পৃথিবী-পৃষ্ঠে। ভলস্কি সেই সব প্রাণীদের নিয়ে গবেষণায় রত হলেন। দেখলেন, প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহে এবং রক্তে নাইট্রোজেন ঘটিত মূল্যবান উপাদানগুলির ঘাটতি ঘটেছে। সেই থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, আমাদের শরীর বিশেষ কোন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাস থেকে অহরহ নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে চলেছে। যাঁরা এই অনুমানটিকে খাড়া করেছেন, তাঁরা কিন্তু সেই বিশেষ প্রক্রিয়াটির কোন পরিচয় প্রদান করতে পারেননি। তাই ভলস্কির মতবাদও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়নি। ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সেই প্রক্রিয়াটির সন্ধান মানুষ লাভ করে তাহলে সেই দিনই ভলস্কির মতবাদকে যুগান্তকারী রূপে আখ্যা প্রদান করা হবে।

পৃথিবীর উন্নত জীবগোষ্ঠী নাইট্রোজেনকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে সংশয় থাকলেও দেখা গেছে এক শ্রেণীর জীবাণু নাইট্রোজেনকে সরাসরি বাতাস থেকে গ্রহণ করতে পারে। তার জন্য আমরা এবং উদ্ভিদ জগৎ কম উপকৃত হচ্ছিনা। সীম জাতীয় কিছু কিছু উদ্ভিদের শেকড় পরীক্ষা করলে দেখা যায়, শেকড়ে থাকে ছোট বড় বেশ কয়েক ধরনের গুটি। ঐ গুটি-গুলি প্রস্তুত করে এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া। তারা বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে উৎপাদন করে প্রোটিন। সেই প্রোটিন নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করা সত্ত্বেও কিছুটা উদ্‌বৃত্ত হয়। ব্যাক্টিরিয়া তখন সেই উদ্‌বৃত্ত প্রোটিন দান করে আশ্রয় দাতাকে। মটর, ছোলা, ধঞ্চে, বিউলি প্রভৃতি বহু গাছের শেকড়ে ওদের বাসা বাঁধতে দেখা যায়। প্রোটিনের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই যে সহ-অবস্থান—তা সত্যই বড় আশ্চর্যজনক।

বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় বাতাসের নাইট্রোজেনের আরও বহু বিস্ময়কর অবদান আবিষ্কৃত হয়েছে। নাইট্রোজেন সাধারণত অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। কিন্তু আকাশে বিদ্যুতের স্ফুরণ ঘটলে প্রচুর তাপমাত্রার উদ্ভব হয় বলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে গঠন করে নাইট্রিক অক্সাইড নামে এক প্রকার গ্যাস। উক্ত গ্যাসটি আবার অক্সিজেনের পরিবেশে নিজেকে অবিকৃত রাখতে পারে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়ায় উৎপন্ন করে নাইট্রোজেন পার অক্সাইড নামে আর একটি গ্যাস। এই গ্যাসটি আবার জলে অতি মাত্রায় দ্রবণীয়। তাই বৃষ্টিপাতের সময় ওরা সরাসরি জলে দ্রবীভূত হয়ে নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে। জলে দ্রবীভূত হলেই তার পরিণাম ঘটে নাইট্রিক অ্যাসিড রূপে।

পৃথিবীর মাটিতে থাকে হরেক রকমের ক্ষার জাতীয় যৌগিক পদার্থ। নাইট্রিক অ্যাসিড উপরোক্ত উপায়ে ভূপতিত হওয়ার পর মাটিতে অবস্থিত যৌগিক পদার্থগুলির সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং গঠন করে নানা ধাতব নাইট্রেট। নাইট্রেট আবার সহজে জলে দ্রবীভূত হয়। তাই উদ্ভিদের পক্ষেও সুবিধা হয় নাইট্রেটের ভেতর থেকে নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করতে। উদ্ভিদ কর্তৃক প্রস্তুত প্রোটিন নামক খাদ্যের মূল উপাদান নাইট্রোজেন আসে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

জীব নিজে প্রোটিন প্রস্তুত করতে পারে না। অথচ প্রোটিন জীবদেহের একটি অপরিহার্য খাদ্যোপাদান। এই কারণে জীবমাত্রই উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এমনকি যে সব মাংসাশী প্রাণী উদ্ভিদ ভক্ষণ করে না, তারা গ্রহণ করে একমাত্র উদ্ভিদভোজী প্রাণীর মাংস। উদ্ভিদ দ্বারা প্রস্তুত প্রোটিনকে বলা হয় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। প্রাণীরা ঐ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে ভক্ষণ করার পর তাদের দেহে উৎপন্ন হয় প্রাণীজ প্রোটিন। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা ঐ প্রাণীজ প্রোটিনকেই গ্রহণ করে থাকে।

নাইট্রোজেন না হলে উদ্ভিদের একেবারেই চলে না। অপরদিকে প্রাণীজগৎ উদ্ভিদজগতের উপর নির্ভরশীল। তাইতো মানুষ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত লবণ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করে সার হিসাবে ব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে মানুষ নির্ভর করছে বাতাসের নাইট্রোজেন ভাণ্ডারের উপর। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাতাসের নাইট্রোজেনকে মাটিতে নামিয়ে আনা হচ্ছে সেই সব পদ্ধতির মধ্যে বিজ্ঞানী হেবার উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাস থেকে

সংগ্রহ করা নাইট্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প থেকে সংগ্রহ করা হাইড্রোজেনকে সরাসরি তাপ, চাপ ও অনুঘটকের মাধ্যমে যুক্ত করে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়।

প্রাকৃতিক উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন নেমে আসছে মাটিতে। বর্তমানকালে আবার মানুষের সারের চাহিদার অন্ত নেই। তাছাড়া অন্যান্য আরও বহু প্রয়োজনে মানুষ বাতাসের নাইট্রোজেনকে ব্যয় করছে। কিন্তু বাতাসের নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার কী অফুরন্ত? নানাদিক থেকে খরচ করলে একদিন না একদিন নিঃশেষ হতে বাধ্য। তখন তাহলে কেমন করে চলবে?

পণ্ডিতেরা মনে করেন, বাতাসে নাইট্রোজেনের ঘাটতি কোনদিনই ঘটবে না। কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরাই। বিজ্ঞানীদের মতে বাতাসের নাইট্রোজেন বিভিন্ন উপায়ে মাটিতে নেমে এলেও কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়পূরণ হচ্ছে। ক্ষয়পূরণের নীতিটি কিন্তু ভারী চমৎকার।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা কম নয়। প্রতিদিন কোটি কোটি জীবজন্তু মাটিতে তাদের মলমূত্র পরিত্যাগ করছে। দৈনিক কত জীবদেহ ও উদ্ভিদদেহ মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে। মাটিতে একশ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া বাস করে—যাদের কাজ হচ্ছে, জীব ও উদ্ভিদদেহ এবং প্রাণীর মলমূত্র প্রভৃতি থেকে নাইট্রোজেনকে মুক্ত করা। ওদেরই দ্বারা নাইট্রোজেন মাটি থেকে যাচ্ছে বাতাসে। এই শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়াদের বলা হয় "ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া"। বাতাস থেকে মাটিতে নাইট্রোজেনের নেমে আসা এবং ব্যাক্টিরিয়াদের দ্বারা মাটির নাইট্রোজেনকে পুনরায় বাতাসে ফিরিয়ে দেওয়া—এই যে হরণ-পূরণ, এর নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা নাইট্রোজেন চক্র।

মাটিতে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া ছাড়া আরও এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া বাস করে। এই জাতীয় ব্যাক্টিরিয়াদের কাজ হচ্ছে, মাটিতে মিশে থাকা প্রাণীর মলমূত্র জীব ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ এবং পৃথিবীর বুকে আকাশ থেকে বৃষ্টির সঙ্গে নেমে আসা নাইট্রিক অ্যাসিডকে নাইট্রেট লবণে রূপান্তরিত করে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান হিসাবে উপহার দেওয়া। এরা কৃষকদের পরম বন্ধু এবং এদের নাম নাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পৃথিবী জন্ম মুহূর্তে যে বায়ুমণ্ডলকে ধরে রেখেছিল তাতে যদি কালক্রমে এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেনের সৃষ্টি না হত তাহলে হয়ত এই জাতীয় জীব ও উদ্ভিদজগতের জীবনধারণ পৃথিবীর বুকে সম্ভব হতো না।

কারবন ডাই অক্সাইড

এক গ্লাস স্বচ্ছ চুনের জলের সঙ্গে বায়ুর সংমিশ্রণ ঘটলে জলটা ঘোলা হয়ে যায়। তাছাড়া চুনের জলে ভর্তি একটা পাত্রকে কয়েকদিন ফাঁকা জায়গায় রেখে দিলে জলের উপর ক্যালসিয়াম কারবনেটের শক্ত সর পড়ে যায়। উক্ত পরীক্ষাগুলি প্রমাণ করে বায়ুতে কারবন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতি।

বায়ুতে কারবন ডাই অক্সাইডের উপস্থিতির কথা প্রথমে বোধহয় শুনিয়ে ছিলেন প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল রাদার ফোর্ড। সেদিন তিনি অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন, বাতাসের উপাদান প্রধানত তুটি। একটি উপাদান স্বচ্ছ চুনের জলকে ঘোলা করে এবং অপর উপাদানটি একেবারে নিষ্ক্রিয়। যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য ছিল না তথাপি সেদিন তাঁর কথায় বড় একটা আস্থা স্থাপন করেননি কেউ। পরের দিকেই কারবন ডাই অক্সাইড সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা কয়েক জনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আরও কিছুকাল পরে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন, চুনাপাথরকে পোড়ালে এক ধরনের গ্যাস পাওয়া যায়। পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ল, গ্যাসটি বেশ ভারী এবং চুনের জলকে ঘোলা করে। তখনই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাদার ফোর্ডের পরীক্ষা। বহু বিজ্ঞানী এবার এগিয়ে এলেন বাতাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য। শেষে স্বীকার করে নেওয়া হল বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের অস্তিত্বের কথা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ঐখানে থেমে গেলেন না। বাতাসে উক্ত গ্যাসের পরিমাণটাও নির্ধারণ করতে এগিয়ে এলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হল, বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ০.০৩ ভাগের মত। তবে কোন কোন স্থানের বায়ুতে উক্ত গ্যাসের পরিমাণ আরও অধিক থাকে।

সেকালে বিজ্ঞানীরা কারবন ডাই অক্সাইডের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিস্মিত বড় কম হন নি। এটি এমন একটি গ্যাস—যা বাতাসের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা অনেক ভারী। বিষাক্ত নয় অথচ শ্বাসগ্রহণ করা যায় না। নিজে জ্বলে না, জ্বলতে সাহায্যও করে না। বরং অত্যন্ত ভারী হওয়ার জন্য আগুনকে নেভাতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা আরও বুঝতে পারলেন, কারবন ডাই অক্সাইড ভারী হওয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠের এখানে ওখানে জমা হয়ে থাকতে বাধা নেই। এই সূত্র ধরে কতকগুলি প্রাকৃতিক রহস্যের আবরণও উন্মোচন করেন তাঁরা।

দীর্ঘকাল ধরে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন স্থানে (যদিও বিরল সেই স্থানগুলি) কারবন ডাই অক্সাইডের রহস্যজনক উপস্থিতি মানুষকে ভাবিয়ে এসেছিল। বর্ণহীন, গন্ধহীন অথচ ভারী এই গ্যাসটি সম্বন্ধে মানুষ আগে কিছু জানতো না। কোন কোন গহন বনের অভ্যন্তরে, গিরিগুহা অথবা গভীর খাদে এবং খাদের কাছাকাছি অঞ্চলে মানুষ অথবা কোন জীবজন্তু দৈবক্রমে উপস্থিত হলে ছটফট করতে করতে মারা যেত। তাই মানুষ মনে করতো, গহন অরণ্যে কিংবা গিরিগুহায় বাস করে মহাশক্তিশালী কোন দৈত্য অথবা অশরীরীরা। কাছে পিঠে কোন জীবকে পেলে গলা টিপে মেরে ফেলে।

পৃথিবীর বুকে এই ধরনের জায়গা এখনও আছে। জাভার ডেথভ্যালির কথা প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভুলক্রমে কেউ সেখানে গেলে তাকে আর জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসতে হয় না। এখনও দেখা যায় ডেথভ্যালির চারদিকে ছড়িয়ে আছে পশুপাখী ও মানুষের কঙ্কাল। বিজ্ঞানীদের অনুমান, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই অঞ্চলটা।

নেপেল্‌সের কাছে একটি বড় অদ্ভুত ধরনের গিরিগুহা আছে। গুহাভ্যন্তরে মানুষ প্রবেশ করলে মানুষের কিছু হয় না। অথচ ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ার প্রবেশ করা মাত্রই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। এমনকি যদি কেউ কুকুরকে সঙ্গে করে গুহায় প্রবেশ করে তাহলে কুকুরটি চিৎকার করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে অথচ মানুষটির কিছু হবে না। আবার কেউ যদি সেই কুকুরটিকে ধরার জন্য নুয়ে পড়ে তাহলে তার অবস্থাও ঐ কুকুরের মত হবে। বিশেষজ্ঞরা সেখানে গিয়ে হিসেব করে দেখেছেন, গুহাটির অভ্যন্তরে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত উচ্চতা কারবন ডাই অক্সাইডের স্তর বর্তমান। তিন ফুটের উপরে আছে বায়ু। তিন ফুটের কম উচ্চতা বিশিষ্ট প্রাণীরাই তাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই ধরনের জায়গা আছে। বিশেষ করে যে সব ঘন বনে সূর্যকিরণ ভালভাবে প্রবেশ করতে পারে না সেই সব বনের কোথাও কোথাও আবহমানকাল ধরে কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমা হয়ে আছে। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলেও এমন স্থান দু একটি আছে। আজকাল বুদ্ধিমান মানুষ বুঝে নিয়েছে সেই সব স্থানের প্রকৃত রহস্য। ভুলেও কেউ যায় না সেখানে। কোথাও কোথাও এই ধরনের বিপজ্জনক স্থানকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলাও হয়েছে। জানা গেছে, সুগভীর কোন গর্তে, কয়লা খনির খাদে, বহুদিনের

অব্যবহার্য কূপের মধ্যে কারবন ডাই অক্সাইড অনেক সময় জমা হয়ে থাকে। তাই আজকের সাবধানী মানুষ মাটির তলায় কোন গর্তে অবতরণ করার পূর্বে একটি মোমবাতি জ্বেলে এগিয়ে দেয় গর্তের মধ্যে। যদি বাতিটা নিভে যায় তাহলে বুঝতে হবে ওখানে কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমা হয়ে আছে। অন্যদিকে যদি কোন দাহ্য গ্যাস থাকে তাহলে জ্বলে উঠবে।

কয়লা পোড়ালে এবং উনান জ্বালালেও কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। তাই শিল্পাঞ্চলের বায়ুতে উক্ত গ্যাসের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি থাকে। বিষাক্ত না হলেও গ্যাসটি শ্বাসকার্যের সহায়ক নয়। তাই বায়ুতে এর পরিমাণ বাড়লে জনস্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া করে। অন্য দিকে কয়লার ধোঁয়ায় অতি অল্প পরিমাণ হলেও কতকগুলি বিষাক্ত গ্যাস থাকে। এই সব কারণে শিল্পাঞ্চলের বায়ু তাড়াতাড়ি দূষিত হয়।

আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গেও কারবন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়। ভারী গ্যাস বলে হঠাৎ অপসারিত হয় না। সেই কারণে শীতের দিনে রুদ্ধ ঘরে রাত্রি যাপন করা উচিত নয়। কোন অঘটন হয়ত ঘটবে না কিন্তু শরীরের উপর খারাপ ক্রিয়া হবে। আগে গ্রাম-বাংলায় প্রসূতিদের রাখা হতো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে। সেখানে সারারাত ধরে জ্বলতো প্রদীপ। আগুনও জ্বালানো হতো। ফলে ঘরের সমূহ অক্সিজেন ব্যয়িত হয়ে ভরে উঠতো কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাসে। দম বন্ধ হয়ে মারা যেত শিশু ও প্রসূতি উভয়েই। কারবন ডাই অক্সাইডের রহস্যটা তখন অজানা ছিল বলে ঘটনাগুলোকে ভূত-প্রেতদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো।

পৃথিবীপৃষ্ঠে কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস অহরহ উৎপন্ন হচ্ছে নানা কারণে। জীবমাত্রই বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়। সেই অক্সিজেন শরীরের অভ্যন্তরে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা খাদ্যদ্রব্যের সারাংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে মৃদু দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তারই ফলে সব সময় উৎপন্ন হচ্ছে কারবন ডাই অক্সাইড এবং জীব নিঃশ্বাসের সঙ্গে উক্ত গ্যাসকে পরিত্যাগ করছে বাতাসে। পরিমাণ অবশ্য নেহাৎ কম নয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন বাতাসে ত্যাগ করছে প্রায় দু পাউণ্ডের মত কারবন ডাই অক্সাইড। পৃথিবীর অগণিত মানুষ ও জীবজন্তুর কথা চিন্তা করলে বাতাসে পরিত্যক্ত উক্ত গ্যাসের পরিমাণ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—তা যেন কল্পনার মধ্যেও আনা যায় না। সেই সৃষ্টির আদি থেকে জীব বাতাসে পরিত্যাগ করে চলেছে কারবন ডাই অক্সাইড। অন্যদিকে উদ্ভিদেরাও শ্বাসকার্য চালায় বলে

সুদূর অতীত থেকে তারাও বাতাসে ত্যাগ করে চলেছে কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস।

কেবল জীব ও উদ্ভিদ নয়, কতকগুলি প্রাকৃতিক কারণেও বাতাসে জমা পড়ছে কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূগর্ভ থেকে উত্থিত হচ্ছে কারবন ডাই অক্সাইড, ভূপৃষ্ঠের ফাটল থেকে নির্গত হচ্ছে কারবন ডাই অক্সাইড, প্রতিদিন রাশিকৃত কয়লা কাঠ চুনাপাথরকে পুড়িয়ে মানুষ বাতাসে জমা করছে কারবন ডাই অক্সাইড। কিন্তু এত কারবন ডাই অক্সাইড যাচ্ছে কোথায়? এতদিনে পৃথিবীর উপরিভাগ তো কারবন ডাই অক্সাইডের আবরণে ঢেকে যাওয়ার কথা! কেন যায়নি তাহলে?

বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন, উপরোক্ত প্রণালীতে বাতাসে সতত কারবন ডাই অক্সাইড জমা পড়লেও বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আদৌ বাড়ছে না। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করেছেন, বাতাসের কারবন ডাই অক্সাইডের একটা বিরাট অংশ প্রতিদিন ব্যয় হচ্ছে উদ্ভিদের অঙ্গার আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। গাছের পাতায় থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র। পাতার রন্ধ্রপথে যখন বাতাস প্রবেশ করে তখন পাতার ক্লোরোফিল বায়ুস্থিত কারবন ডাই অক্সাইডকে সূর্যালোকের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করে এবং জলের সংযোগে দেহে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ নিজেও যেমন গ্রহণ করে সেই খাদ্য তেমনই সঞ্চয়ও করে রাখে পাতায়। জীব উক্ত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। অথচ খাদ্যটি জীবদেহের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। তাই উদ্ভিদ দেহ থেকেই খাদ্যটি জীবকে গ্রহণ করতে হয়।

কারবন আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় কারবন ডাই অক্সাইড ভেঙ্গে গিয়ে কারবন ও অক্সিজেনে পরিণত হয়। উদ্ভিদ কারবন গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে বাতাসে। ফলে বাতাস হচ্ছে শুদ্ধ। আর আগুন জ্বালাতে এবং জীব ও উদ্ভিদের শ্বাসকার্য চালাতে বায়ু থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রতিদিন ব্যয়িত হচ্ছে এক রকম সেই পরিমাণ অক্সিজেন কারবন আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জমা দিচ্ছে বাতাসে। রাত্রিকালে কিন্তু আকাশে সূর্য থাকে না বলে উদ্ভিদ কারবন আত্তীকরণের কাজ বন্ধ রাখে। আর শ্বাসকার্যের ফলে উৎপন্ন কারবন ডাই অক্সাইডে গাছের তলাটা ভরে যায়। অপরদিকে আশে পাশের বাতাস থেকে কারবন ডাই অক্সাইডকেও কাছে টেনে আনে—যাতে পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রক্রিয়া চলতে পারে।

বাতাসের কারবন ডাই অক্সাইড অন্য উপায়েও খরচ হচ্ছে। যেহেতু কারবন

ডাই অক্সাইড জলে কিছু পরিমাণে দ্রবীভূত হয়, তাই পৃথিবীর উপরিভাগে বিস্তীর্ণ জলরাশি প্রতিদিন কিছু কিছু বাতাসের কারবন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করে নিচ্ছে। উক্ত কারণেই জলজ উদ্ভিদেরা নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যোপাদান প্রস্তুত করতে সক্ষম হচ্ছে। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠে যে সব পাহাড় পর্বত আছে তাদের পাথর ও বাতাসের কারবন ডাই অক্সাইডের একটা বড় অংশকে সব সময় আত্মসাৎ করে চলেছে। তারই ফলে পাহাড় পর্বতের পাথর ক্ষয় হয়ে তৈরি করছে কারবনেট যৌগ। সেই কারবনেট গুলির কেউ কেউ আবার জলে দ্রবীভূত হতে পারে। দ্রবণীয় কারবনেটগুলি তাই বৃষ্টির জলে ধৌত হয়ে নদী, সাগর ও মহাসাগরের বুকে জমা হচ্ছে। সাগর মহাসাগরে যে অসংখ্য প্রাণী বাস করে তাদের মধ্যে কীট জাতীয় প্রাণীরা জলে দ্রবীভূত কারবনেটকে গ্রহণ করে নিজেদের দেহের চারদিকে শক্ত আবরণ গঠন করে নেয়। পরোক্ষ উপায়ে উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাণীদের দ্বারা গৃহীত কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণও বড় কম নয়। দেখা গেছে, এই জাতীয় প্রাণীরা যখন মারা যায় তখন তাদের দেহের শক্ত খোলস স্তরে স্তরে জমা হয়ে চুনাপাথর কিংবা ডলোমাইটের বিরাট বিরাট পাহাড় সৃষ্টি করে। ওদের আবার পোড়ালে কারবন ডাই অক্সাইড মুক্ত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ সবসময় প্রায় স্থিরই আছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, আদিম পৃথিবীতে বায়ুস্থিত কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আজকের দিনের চেয়ে অনেক বেশিই ছিল। কারণ হিসাবে তাঁরা উল্লেখ করেন, সেকালে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ ছিল ভয়ানক অস্থির। যখন তখন ভূপৃষ্ঠের এখানে ওখানে ফাটল সৃষ্টি হতো এবং সেই ফাটল দিয়ে প্রায়ই নির্গত হতো কারবন ডাই অক্সাইড। সে সময় অগ্ন্যুৎপাতের পরিমাণও ছিল আজকের তুলনায় অনেক—অনেক বেশি, তাই আগ্নেয়গিরিও প্রচুর পরিমাণ কারবন ডাই অক্সাইড উদ্গীরণ করতো। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, অতীতে বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থাকার জন্যই ডাঙায় সৃষ্টি হয়েছিল আকাশছোঁয়া তরুশ্রেণী। বায়ুর এই উপাদানটি বর্তমানে কম হওয়ার জন্য আগের মত সুউচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অশান্ত ছিল পৃথিবীর বুক আর বাহিরের পরিবেশ ছিল উদ্ভিদের অনুকূল। তাই অল্প কালের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারত আকাশস্পর্শী বৃক্ষরাজির গহন অরণ্যানী। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘন ঘন আসতো। আর তারই ফলে মাটির তলায় তলিয়ে গেছে সেই সব বৃক্ষশ্রেণী। পৃথিবীর আভ্যন্তরীন চাপ ও তাপের

প্রভাবে এবং জীবাণুদের আক্রমণে রূপান্তরিত হয়ে আছে কয়লায়—মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে যার দানই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারবন কয়লা ছাড়া আরও বহু যৌগিক রূপে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। কয়লায় কার্বনের উপস্থিতি শতকরা ৮০ ভাগের মতো; পেট্রোলিয়ামে প্রায় ৮৪ ভাগ, টিম্বারে শতকরা ৫০ ভাগ। কার্বনের মুক্ত অবস্থা হল হীরক ও গ্রাফাইট। পৃথিবীর ভূত্বকের শতকরা ০'২ অংশ কার্বনে গঠিত।

কারবন ডাই অক্সাইড যদি বাতাস থেকে মাটিতে এবং মাটি থেকে পুনরায় বাতাসে যেতে না পারতো তাহলে পৃথিবীর বুকে এমন জীব ও উদ্ভিদ জগৎ সম্ভবত সৃষ্টি হতো না। বাতাসে উক্ত গ্যাসের পরিমাণ বেশি কিংবা কম হলে তার প্রভাব অবশ্যই পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদের উপর পড়তো।

পণ্ডিতেরা অবশ্য এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের বর্তমান যা পরিমাণ তার একটু এদিক ওদিক হলে বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হতো না। কিন্তু পরিমাণটা যদি বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ বা তার একটু বেশি হতো তাহলে জীবের শ্বাসকষ্ট ঘটতো এবং জীব ও উদ্ভিদ জগতের কিছুটা পরিবর্তনও হতো। খুব বেশি হলে, অর্থাৎ শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত হলে কোন প্রাণী বাঁচতে পারতো না। সারা পৃথিবীটা আকাশ ছোঁয়া বৃক্ষের গহন অরণ্যানীতে পূর্ণ হয়ে যেতো। তাপমাত্রাও যেতো বেড়ে।

কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কম হলেও বিপদ হতো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইড আদৌ না থাকলে অথবা অতি অল্প পরিমাণে থাকলে গাছপালা জন্মাত না। তদুপরি পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও যথেষ্ট কম হতো। হিসেব করে দেখা গেছে, কারবন ডাই অক্সাইডের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপমাত্রা অপেক্ষা অন্ততঃ ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম হতো।

বাতাসের কারবন ডাই অক্সাইড পরোক্ষভাবে আমাদের যে উপকার করে তার কোন তুলনা হয় না। উক্ত গ্যাসের উপস্থিতির জন্যই বাতাস লাভ করেছে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা। কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অত্যন্ত কম হলে বাতাস জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতো। তার ফলে তাপমাত্রা যেতো কমে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কারবন ডাই অক্সাইড আদৌ না থাকলে পৃথিবী চির তুষারাবৃত প্রান্তর এবং উন্নত জীব ও উদ্ভিদের অনুপযোগী একটা মৃত জগৎ হয়েই থাকতো। অথবা কালের

কুটিল গতিতে যদি কোন দিন কোন কারণে জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হতো, তাহলে বর্তমানের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য থাকত না।

বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের হ্রাস বৃদ্ধি উদ্ভিদ দেহের উপর কেমন ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—সে সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা চালিয়ে ছিলেন গডলয়েস্কী নামে একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণা লব্ধ ফল থেকে জানা যায়, বাতাসে কারবন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণের তুলনায় দ্বিগুণ হলে উদ্ভিদের কারবন আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় কারবন গ্রহণ প্রায় তিন চারগুণ বেড়ে যেতো। ফলে উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটতো অতি দ্রুত।

কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাসটিকে মানুষ দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করে। পেটের গোলমালে গ্যাসটি বিশেষ ফলপ্রদ বলে ওকে চাপ দিয়ে জলে দ্রবীভূত করে সোডা, লেমনেড প্রভৃতি পানীয় তৈরি করা হয়। ছোট খাটো আগুনকে আয়ত্তে আনতে কাজে লাগে কারবন ডাই অক্সাইডের। গ্যাসটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ওকে চাপের প্রভাবে পিষ্ট করে শীতল করতে থাকলে প্রথমে তরল ও পরে কঠিনে রূপান্তরিত হয়। কঠিন কারবন ডাই অক্সাইডকে বলা হয় শুষ্ক বরফ বা ড্রাই আইস। ড্রাই আইস সাধারণ বরফের মত মাত্র ° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলে গিয়ে তরলে পরিণত হয় না। অপরদিকে সে সোজাসুজি কঠিন থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ড্রাই আইসের এই গুণটির জন্য ব্যবহার করা হয় হিমায়নের কাজে, উড়োজাহাজে রিভেট লাগানোর কাজে, মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে, রক্ত হিমায়নের কাজে, বরফের দেশে লাইফবোটে এবং কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের জন্যে।

কারবন ডাই অক্সাইডের দ্বারা উদ্ভিদের মত মানুষ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে কিনা এ বিষয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানীদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। একটা বড় রকমের বিস্ময়ের কথা, কারবন ও অক্সিজেনের এই যৌগিক গ্যাসটিকে সহজে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। অধিক তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে গ্যাসটির সামান্য অংশ মাত্র বিশ্লিষ্ট হয়। অথচ উদ্ভিদেরা সূর্যালোকের মত সাধারণ উত্তাপে পত্রস্থিত ক্লোরোফিলের সহায়তায় অক্লেশে ওকে ভেঙ্গে ওর ভেতরের সমূহ কারবনকে আত্মসাৎ করে নেয়। উদ্ভিদের এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে মানুষ আজও বিশ্লেষণ করতে পারেনি। যদি কোন দিন উদ্ভিদের উক্ত প্রক্রিয়াকে মানুষ যন্ত্রের মাধ্যমে অনুসরণ করতে সমর্থ হয় তাহলে হয়ত অতি সহজে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে সমর্থ হবে। এমন আবিষ্কার মানুষের পক্ষে সম্ভব হলে পৃথিবীতে

থাকবে না এমন খাদ্যের টানাটানি। ক্রম বর্ধমান মানব জাতির বিরাট খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে ছোট্ট একটি ল্যাবরেটারির প্রকোষ্ঠই যথেষ্ট হবে। প্রয়োজন হবে না কৃষি যোগ্য বিরাট বিরাট জমি। পৃথিবীতে খাদ্য সমস্যাই আর থাকবে না এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অধিকাংশ গুরুতর সমস্যার সমাধান হবে।

বায়ুর অন্যান্য উপাদান

বায়ুর একটি প্রধান উপাদান অক্সিজেনের আবিষ্কারের কাহিনী নাইট্রোজেন ও কারবন ডাই অক্সাইডের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ পাঁচ ভাগের একভাগ। অত্যন্ত সক্রিয় গ্যাস। বহু পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সাইড গঠন করতে পারে। ভূপৃষ্ঠের উপাদান হিসাবে যে সব অক্সাইড বর্তমান, সেগুলি আদিতে ধাতু কিংবা অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের ক্রিয়ায় তৈরি হয়েছিল। এখন প্রশ্ন এই যে আদি আবহমণ্ডলে রাসায়নিকভাবে বিযুক্ত বা মুক্ত অবস্থায় অক্সিজেন আদৌ ছিল না। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত গ্যাস, উল্কাপিণ্ড এবং আদিম শিলাতেও তাকে বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় নি। তাহলে বায়ুমণ্ডলে কালক্রমে অক্সিজেন এল কী করে, কোথা থেকে, ও তার পরিমাণই বা এত বেশি হল কীভাবে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, তিনভাবে এটা সম্ভব হয়েছে। প্রথমত, আবহমণ্ডলের বাইরের স্তরে জলীয় বাষ্প মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা বিভাজিত হয়ে অক্সিজেন সৃষ্টি করেছে, দ্বিতীয়ত উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে মুক্ত অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে, ও জারণের ফলেও অক্সিজেন এসেছে। ধীরে ধীরে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে গত দুশো কোটি বছর ধরে।

অক্সিজেনের আর এক নাম "জীব বায়ু"। কারণ, অক্সিজেন অভাবে পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ কেউ বাঁচতে পারে না। বাতাসে যদি অক্সিজেন আদৌ না থাকতো তাহলে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব ও উদ্ভিদজগৎ কিছুতেই সম্ভব হতো না। অপরদিকে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলেও তার প্রভাব অবশ্য জীব ও উদ্ভিদের উপর প্রতিফলিত হতো। তবে অক্সিজেনের অভাবে পৃথিবী যে মৃতের রাজ্যে পরিণত হতো সে বিষয়ে সকলেই একমত।

অপরদিকে নাইট্রোজেন ও কারবন ডাই অক্সাইডের মত অক্সিজেনেরও

হরণ-পূরণ চলছে। প্রতিদিন জীব ও উদ্ভিদেরা প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছে অক্সিজেনকে এবং আগুন জ্বালাতে ব্যয় হচ্ছে অক্সিজেন। কতকগুলি প্রাকৃতিক উপায়েও বাতাসের অক্সিজেন ব্যয়িত হচ্ছে। তাদের মধ্যে অক্সিজেনের একটা বড় অংশ ব্যয় হয় আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের সময় নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে। মানুষও নানা উপায়ে বাতাস থেকে সংগ্রহ করছে অক্সিজেনকে। বায়ুকে তরল করে অক্সিজেনকে বিচ্ছিন্ন করছে। সেই অক্সিজেন ব্যয় করা হচ্ছে মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসায়, ব্যবহার করছে ডুবুরীরা এবং পর্বতারোহীরা। আজকাল মহাকাশ যাত্রার যুগে অক্সিজেন মহাকাশচারীদের একটা বড় সহায়। কাঠ কিংবা কয়লাকে পোড়ালে বায়ুর এই উপাদানটি ব্যয়িত হয়ে কারবন ডাই অক্সাইড ও কারবন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

নানাভাবে বাতাসের অক্সিজেন ব্যয় হলেও বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ সর্বদাই ঠিক আছে। উদ্ভিদই কারবন আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় সব সময় বিশুদ্ধ অক্সিজেনকে ত্যাগ করছে বাতাসে। তবে মানুষ যদি নির্বিচারে উদ্ভিদ সংহারে প্রবৃত্ত হয়, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খালি জায়গা এবং বনভূমি না রাখে তাহলে পৃথিবীতে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নিঃশ্বাসে যে পরিমাণ কারবন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় তাকে শুদ্ধ করতে প্রয়োজন হয় অন্ততঃ পনের বর্গমিটার খালি জমি। এক কথায় বলা যেতে পারে, আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন ঐ উদ্ভিদরাই। তাই উদ্ভিদ সংরক্ষণে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত। উদ্ভিদ কেবল খাদ্য সরবরাহ করে না, অহরহ বাতাসকে শুদ্ধ করে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার পরিবেশও তৈরি করছে। অপরদিকে বনভূমির বিলোপ সাধন মানুষের আত্মহত্যারই সামিল হবে।

বাতাসের অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে জলীয় বাষ্পই প্রধান। কিন্তু জল সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচিত হওয়ায় বর্তমানে উক্ত প্রসঙ্গকে পরিত্যাগ করা হল। বাকি উপাদানগুলির মধ্যে কেবল নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলিই পড়ে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির মধ্যে আবার প্রধান প্রধান হল হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন ও জেনন। গ্যাসগুলো কোন প্রকারে ক্রিয়া করে না কারও সঙ্গে। তাই তারা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বাতাসের অন্যান্য উপাদান ঠিক থেকে ওদের উপাদান বাড়লে কিংবা কমলে বিশেষ ক্ষতি হতো না। এমনকি আদৌ না থাকলেও জীব ও উদ্ভিদ জগতের উপর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না।

বাতাসের নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির সম্বন্ধে প্রথম আভাস দিয়েছিলেন প্রখ্যাত

রসায়নবিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে। তাঁর পরীক্ষায় প্রভাবিত হয়ে বিজ্ঞানী র‍্যামজে প্রথম আবিষ্কার করেন "আর্গন"কে। আর্গন অর্থে "অলস" বুঝায়। বহু সাধ্য সাধনার পর র‍্যামজে উক্ত গ্যাসটিকে আবিষ্কার করেছিলেন বলে নাম রেখেছিলেন আর্গন।

র‍্যামজের পর বিজ্ঞানী জনসন হিলিয়াম আবিষ্কার করেন। তারপরে বিজ্ঞানী র‍্যামজেই পুনরায় আবিষ্কার করেন নিয়ন নামক অন্য একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে। পরিশেষে বায়ুকে তরল করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয় ক্রিপটন ও জেনন।

রঙ বেরঙের আলোকসজ্জা প্রদর্শনের জন্যই মানুষ নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলিকে ব্যবহার করছে।

পৃথিবীর আলো

পৃথিবীর জীবনের আর এক সহায়ক সূর্যের আলো। অথচ আমাদের পৃথিবীটা যদি সূর্যের কাছাকাছি থাকতো বা সূর্য থেকে তার দূরত্ব আরও অধিক হতো তাহলেও পৃথিবীর অপরাপর বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর বুকে এমন জীবন সম্ভব হতো না। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, এত গুণ পৃথিবী লাভ করল কেমন করে ?

উদাহরণ স্বরূপ প্রথমে বুধের কথা ধরা যেতে পারে। বুধ সূর্যের সন্নিকটে থাকার জন্য তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রচণ্ড। সেই তাপমাত্রায় কোন জীব ও উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না। অপরদিকে আয়তনে ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য আবহমণ্ডল তার নেই। পরবর্তী গ্রহ শুক্র-পৃষ্ঠেও তাপ প্রচণ্ড। ভাল আবহমণ্ডল একটা আছে। কিন্তু সেই আবহমণ্ডলে না আছে জলীয় বাষ্প, না আছে জীবনধারণের উপযোগী অক্সিজেন। এমন বিশাল আয়তনের গ্রহ যে বৃহস্পতি, তারও আছে ভাল আবহমণ্ডল। জন্মকালে জলীর বাষ্পও লাভ করেছিল প্রচুর। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, সূর্য থেকে অনেক দূরবর্তী সে। শীতলতম স্থান অর্থাৎ হিমাঙ্কের ১৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা। আবহমণ্ডলস্থিত সমূহ জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে প্রায় হাজার মাইল গভীর বরফের স্তর সৃষ্টি করেছে। তাই জীব ও উদ্ভিদের অনুপযোগী একটি উপেক্ষিত গ্রহ এই বৃহস্পতি। সূর্যের সুদূরতম গ্রহগুলির পরিণামও একই। তারা বৃহস্পতির চেয়েও শীতল। উন্নত জীব ও উদ্ভিদ কোন কালেই সম্ভব হবে না।

ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত সূর্যদেহ থেকে যে আলো ও তাপ নির্গত হচ্ছে, তার কণামাত্র লাভ করছে পৃথিবী। তাতেই পৃথিবী হয়েছে এমন অপরূপা। এর চেয়ে খুব বেশি কিংবা কম তাপ লাভ করলে সে এমনটি হতে পারতো না বটে তবে দু' এক কোটি মাইলের তফাৎ হলে বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হতো না। এখন কি 'বহির্কক্ষ' গ্রহ মঙ্গলের জায়গায় যদি পৃথিবীর অবস্থান হতো তাহলে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য জীব ও উদ্ভিদ জগতের অধীশ্বরী হতো। মঙ্গল আয়তনে ছোট, ভাল আবহমণ্ডল নেই—সেই কারণে সে এমন দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

এখন প্রশ্ন আসে, সূর্যের আলোটা কী? কেমন করে আলো ছুটে আসছে কোটি কোটি মাইল দূর থেকে?

মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে—যেদিন মানুষ তার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল সেইদিনই তার মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল। সেদিনও অবশ্য মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, পৃথিবীর আলোর উৎস আকাশের ঐ সূর্য। আকাশে সূর্য জেগে উঠলেই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগে। আরও বুঝতে পেরেছিল, সূর্যের আলোতে আমাদের চারদিকের বস্তুরাশি আলোকিত হয়, সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, আকাশের কোণে মেঘ জমে, বৃষ্টি ধারায় স্নাত হয়ে পৃথিবী শস্যশ্যামলা হয় এবং সূর্য নিজের আলোতেই উজ্জ্বল, পৃথিবী কিন্তু সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেই দৃশ্যমান। তাই সূর্যকে দেবতারূপে কল্পনা করেছিল সেদিনের মানুষ। সূর্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে রচিত হয়েছিল কত মন্ত্র ও গান। সে গান একদিন ধ্বনিত হতো অরণ্যে, বন্দরে, সপ্তসিন্ধুর কূলে কূলে।

মানুষ কিন্তু তার জ্ঞানকে ঐখানে সীমাবদ্ধ রাখেনি। একদিন সূর্য সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করে সূর্যের আলোক সম্বন্ধে। ভাবতে শুরু করে, এতদূর থেকে কেমন করেই বা সূর্যের আলো এসে পড়ছে পৃথিবীর বুকে? কেমন করেই বা পৃথিবীর বস্তুরাশি আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বে মানুষের মনে ঠাঁই পেয়েছিল। গ্রীক পণ্ডিতরা মনে করতেন, আলো আমাদের চোখ থেকে নির্গত হয়। দিনের বেলা আকাশে সূর্য থাকে বলে চোখ থেকে নির্গত আলোর পরিমাণ হয় বেশি। আর রাত্রিতে আকাশে সূর্য না থাকায় চোখ থেকে আলো নির্গত হয় অতি অল্প পরিমাণে। গ্রীক দার্শনিকরা আবার আলোর ব্যাখ্যা করতেন অন্যভাবে।

তাতে ঈশ্বরের মহিমাই প্রকাশ পেতো, আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনায় মনকে বিবশ করতো, তবু যেন ঠিক ঠিক মন ভরতো না মানুষের।

তারপর কেটে গেল কতকাল। সূর্য এবং তার আলো সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন গবেষণা হয়নি বলা চলে। ইউরোপে নবজাগরণের দিনে প্রকৃতপক্ষে শুরু হল সূর্যকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা। অবশেষে পৃথিবীর বুকে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন বিজ্ঞানী নিউটন। বিজ্ঞানের অনেকগুলি শাখাকে পুষ্ট করলেন তিনি। সূর্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন, সূর্য একটি জ্বলন্ত অগ্নিময় গোলক। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করছে। তার দেহনিঃসৃত তেজই হচ্ছে আলো। সেই আলো ভেসে আসছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে।

প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক ও জ্যামিতিবিদ পিথাগোরাস এই ধরনের একটি মতবাদ রেখেছিলেন এবং নিউটনের কিছু আগে অর্থাৎ ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে লেডেনের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক উইলি ব্রড স্নেল আবিষ্কৃত আলোক প্রতিসরণের সূত্রটিকে ফ্রান্সের সুবিখ্যাত অঙ্কবিজ্ঞানী ও দার্শনিক রেঁনে দেকার্ত প্রচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, আলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। কিন্তু ওঁদের কারও যুক্তি তেমন জোরাল ছিল না। নিউটনই বললেন, কেবল সূর্য নয়, যে কোন আলোক উৎস থেকে তীব্র গতিতে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসে একরকম উজ্জ্বল কণিকা। এরা সব সময় সরলরেখায় চলে, বক্রপথের ধার ধারে না।

নিউটন অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে আলোক সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপরোক্ত মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর আলো সম্বন্ধে এই মতবাদটি প্রভাবিত করে অনেককে। যাঁরাই আলো সম্বন্ধে মাথা ঘামাতেন তাঁরাই এবার হাতের কাছে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে গেলেন, আলোকের ধর্মগুলিকে নিউটনের "কণিকা বাদের" সাহায্যে প্রমাণ করতে।

অবশেষে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, আলোকের প্রতিফলন, আলোকের প্রতিসরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে নিউটনের নিয়ম মেনে চলছে। কিন্তু আলো যখন লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমে অথবা ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে যাতায়াত করে তখন নিউটনের নিয়ম মানে না। বিজ্ঞানীরা ক্ষুণ্ন হলেন একটু। তবুও স্বীকার করে নিলেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে। ভাবলেন তাঁরা, কোন কোন ক্ষেত্রে এক আধটু ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে ব্যতিক্রম হবে কেন? একটি যুক্তিকে অবলম্বন করে

যদি আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করা না গেল তাহলে সেই যুক্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তি রূপে কেন আখ্যা লাভ করবে?

নিউটনের পরে ইয়ং নামে এক বিজ্ঞানী আলোকের আর একটি নতুন ধর্মের আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোক রশ্মির সংযোগ ঘটালে উজ্জ্বলতার পরিবর্তে অন্ধকারেরই সৃষ্টি হয়। আলোর এই ধর্মটাকে তিনি নাম দিলেন ইণ্টারফিয়ারেন্স। নিউটনের কণিকা তত্ত্ব উক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন সুফল পাওয়া গেল না। তখনই বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন এল, আলোক যদি কণিকার সমষ্টি হয় তাহলে দুই কণিকার সংঘর্ষে কী ধ্বংস হয়ে যায়? কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? তাই ইয়ং-এর আবিষ্কারের পর পুনরায় আলো সম্বন্ধে চিন্তা করতে বসলেন বিজ্ঞানীরা।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিউজেনস নামে একজন বিজ্ঞানী আলোকের ক্ষেত্রে আর এক মতবাদের অবতারণা করলেন। তিনি কল্পনা করলেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা এক অদৃশ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। সেই পদার্থটির নাম ঈথার (ঈথারের কল্পনা বহু পূর্বে গ্রীক বিজ্ঞানীরা করেছিলেন)। আলো কোন উৎস থেকে উত্থিত হয়ে তরঙ্গাকারে ঈথারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। স্থির পুষ্করিণীর বুকে একটুকরা মাটি কিংবা পাথরকে নিক্ষেপ করলে যেভাবে উৎস থেকে জলের তরঙ্গ উত্থিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কতকটা যেন সেইভাবে আলোক ছড়িয়ে পড়ে ঈথারের মাধ্যমে। তফাৎ এই যে, জলের তরঙ্গকে আমরা প্রত্যক্ষ করি কিন্তু ঈথার তরঙ্গকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না।

তিনি ব্যাখ্যা করলেন, ঈথারের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গগুলি আমাদের চোখে এসে পড়ে। তারপর আমাদের চোখের আলোকগ্রাহী স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করে। তখনই আমরা দেখবার শক্তি লাভ করি। হিউজেনস প্রবর্তিত উক্ত মতবাদ বিজ্ঞানীদের বেশ মনে ধরল এবং এই মতবাদের নামকরণ করা হল "আলোকের তরঙ্গবাদ।"

নিউটনের কণিকাবাদকে যেমন যাচাই করেছিলেন বিজ্ঞানীরা, ঠিক সেই-ভাবে বিজ্ঞানীরা যাচাই করতে এড়িয়ে এলেন এই তরঙ্গবাদকে। শুরু হল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিজ্ঞানীরা একাধিক ক্ষেত্রে সুফলও লাভ করলেন। এমনকি যে সব ক্ষেত্রে নিউটনের কণিকাবাদ ব্যর্থতা বরণ করেছিল সে সব ক্ষেত্রেও তরঙ্গবাদ প্রয়োগ করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, অতি সাধারণ দু একটি ক্ষেত্রে তরঙ্গবাদ বিশেষ সুবিধা করতে পারল না।

প্রথমত তরঙ্গবাদ ব্যাখ্যা করতে পারল না আলোক যে সরলরেখায় চলে

এই সত্যটি। অথচ নিউটনের কণিকাবাদ উক্ত সত্যকে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে। দ্বিতীয়ত আলোর পোলারিজেসনের ক্ষেত্রেও তরঙ্গবাদ হল ব্যর্থ। আলোর পোলারিজেসন হচ্ছে, আলোক উৎস থেকে আলোক যে তরঙ্গের আকারে ভিন্ন ভিন্ন মুখে ছড়িয়ে পড়ে সেই তরঙ্গগুলির ভেতর থেকে কোন একটি বিশেষ দিকে প্রবাহিত তরঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা।

বিজ্ঞানীরা আবার চিন্তান্বিত হলেন। ফ্রেনল নামে এক বিজ্ঞানী তরঙ্গবাদকে একটু রদবদল করে ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করলেন। ঈথার সম্পর্কেও একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করলেন। বললেন, বাতাসে ঈথার তরঙ্গ না থাকলে কোন তরঙ্গেরই প্রবাহ ঘটতে পারে না। ঈথার হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণিকা—বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কোন তরঙ্গ প্রবাহ ঘটলে ঈথার কণিকাগুলি লম্ব বরাবর কাঁপতে থাকে।

এবার এল ফ্রেনলের তত্ত্বকে প্রয়োগ করার পালা। কিছু কিছু সুফল অবশ্য পাওয়া গেল। কিন্তু অদৃশ্য বস্তু সেই ঈথারের চিন্তাটা এবার পেয়ে বসল বিজ্ঞানীদের। সবার মনে প্রশ্ন এল, ঈথার জিনিসটি কী? এটি এমন কী বাহন —যার দ্বারা আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে? বাস্তব জগতে এমন কোন জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার সঙ্গে ঈথারের অন্ততঃ একটু মিল আছে? ওকে দেখা যায় না, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না, কোন পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে না অথচ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—কী এমন জিনিস?

এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, আলোর সঙ্গে বিদ্যুৎ বা চুম্বকের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কার করলেন তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব নামে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করে দেখা গেল, আলোক এক ধরনের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে আলোর তরঙ্গ তত্ত্বকে নিয়ে এতদিন বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে আসছিলেন সেই তত্ত্বেরই উপর হানল প্রচণ্ড আঘাত।

ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে বিজ্ঞানী হার্ৎস একদিন গবেষণাগারেই উৎপন্ন করলেন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে। এবার আর কারও কিছু বলার থাকল না। সুপ্রতিষ্ঠিত হল ম্যাক্সওয়েলের মতবাদ। সেই সঙ্গে হার্ৎস প্রমাণ করলেন, তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গগুলি আলোর প্রায় সমূহ ধর্মকে মেনে চলে এবং শূন্য মাধ্যমে এর গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান।

ইয়ং, ফ্রেনল প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আলোকের তরঙ্গবাদ

এবার ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হল। অপরদিকে র‍্যালে প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা আলোর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রবর্তন করলেন কোয়াণ্টাম তত্ত্ব বা ফোটনবাদ নামে এক বৈপ্লবিক মতবাদ। প্ল্যাঙ্ক প্রবর্তিত ফোটনবাদকে আবার কণিকাবাদও বলা যেতে পারে।

প্ল্যাঙ্কের ফোটনবাদকে পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রয়োগ করে এতদিনে বহু গুরুতর সমস্যার সমাধান করলেন বিজ্ঞানীরা। সেই সঙ্গে তাঁরা সচেষ্ট হলেন আলোকের ক্ষেত্রেও ফোটনবাদকে প্রয়োগ করতে। অবশেষে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন উক্ত তত্ত্বকে প্রয়োগ করে ঈথারের কল্পনাকে একেবারে উড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ প্রমাণিত হল, ঈথার একেবারে কাল্পনিক বস্তু। বিশ্বের কোথাও ঈথারের কোন অস্তিত্ব নেই।

আইনস্টাইনই প্রমাণ করলেন, আলোক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকণার সমষ্টি। সেই শক্তিকণাগুলোই কোয়াণ্টাম বা ফোটন। এই শক্তির বিকিরণ আবার নিরবচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময় অন্তর শক্তিকণাগুলো তরঙ্গাকারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অন্যদিকে এই কোয়াণ্টাম বা ফোটনগুলির প্রত্যেকে তার সমস্ত শক্তি কোন অণু বা পরমাণুকে অক্লেশে দানও করে দিতে পারে। আরও প্রমাণিত হল, ফোটন কণার আকৃতিগত পার্থক্যের জন্যই আলো বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে।

আলোর ফোটনবাদ নিউটনের কণিকাবাদকে অনেকাংশে সমর্থন করল। কিন্তু আলোর তরঙ্গবাদ একেবারে পরিত্যক্ত হল না। দুই মতবাদের কিছু কিছু গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন বিজ্ঞানীরা। শেষে বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গ ও বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিংগারের প্রচেষ্টায় উপরোক্ত দুই মতবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনয়ন করা হয়। সর্বশেষে বিজ্ঞানী নীলসবোর সিদ্ধান্ত করলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুকে চিন্তা করার দুটি পরিপূরক পন্থা হল তরঙ্গবাদ ও কণিকাবাদ। এই জাতীয় বস্তুকে ভালভাবে বিচার করতে হলে দুই মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এতদিনে বিজ্ঞানীরা আলোকের কণিকাবাদ এবং তরঙ্গবাদ দুটি মতবাদকেই স্বীকার করে নিলেন।

সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সূর্যের আলোর রঙ সাদা নয়—সাত-সাতটি বর্ণের সমষ্টি। বর্ণগুলি যথাক্রমে বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, সাত রঙের সমষ্টিকে সাদা দেখায়। আরও প্রমাণিত হয়েছে, কোন বস্তুর উপর আলো পড়লে সেই

আলোর কিছু পরিমাণ প্রতিফলিত, কিছুটা প্রতিসরিত এবং কিছুটা শোষিত হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কোন বস্তুকে লাল দেখার কারণ, সূর্যরশ্মির সাত রঙের ঐ লাল ব্যতীত আর সব রঙগুলিই শোষিত হয়ে যায়। অর্থাৎ লাল বস্তু একমাত্র লালকে শোষণ করতে না পেরে ফিরিয়ে দেয়। বস্তুকে কালো দেখার কারণ, আলোর সমস্ত শক্তি তথা রঙকে সেই বস্তু শোষণ করতে পারে।

সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করে সূর্যের উপাদানও নির্ণয় করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখেছেন, সূর্যদেহের প্রধান উপাদান হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন। পার্থিব বস্তুর পরিমাণ সূর্যদেহে নিতান্তই কম। একটা হিসেবও দাখিল করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে সূর্যদেহে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৮১·৭ ভাগ, হিলিয়াম ১৮·১৭ ভাগ। অন্যান্যদের মধ্যে ০·০৭ ভাগ কারবন, অক্সিজেন, লোহা, দস্তা, তামা প্রভৃতি।

সূর্যের অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিক্রিয়াই সূর্যের তাপ ও আলোর উৎস। প্রচণ্ড তাপের জন্য প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫৭ কোটি টন হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করছে হিলিয়ামকে। তার ফলে যে তেজ উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলি সূর্যপৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই তেজের ভগ্নাংশমাত্র এসে পড়ছে পৃথিবীর উপর। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ তেজ বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে কেবল সেইটুকুই পৃথিবী জন্ম থেকে এ পর্যন্ত লাভ করেছে কিনা সন্দেহ। অথচ সূর্যের এই নগণ্য তেজ গ্রহণ করেই পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদজগৎ টিকে আছে, বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে, ঝড়ঝঞ্ঝা হচ্ছে, মাটির ক্ষয় হচ্ছে, তুষার গলা জলে পুষ্ট হচ্ছে নদী, আকাশের কোণে মেঘ জমছে, বৃক্ষাদিতে সংরক্ষিত সৌর তেজ রূপান্তরিত হচ্ছে কয়লায়। মোট কথা, পৃথিবীর সব শক্তিরই মূল উৎস সূর্যের আলো ও তাপ। গভীর ভাবে চিন্তা করলে আরও দেখা যাবে, আধুনিক সভ্যতার উপকরণ সংগ্রহ করতে যে সব শক্তির দরকার হচ্ছে তার প্রায় সবটুকুই পরোক্ষ ভাবে দান করছে সূর্য। বর্তমানে আবার শিল্পের কাজে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, এমনকি রান্নার কাজেও প্রত্যক্ষভাবে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। অনেকটা সফলও হয়েছেন তাঁরা। মনে হয়, আগামী এক অথবা দু-দশকের মধ্যে কঠিন ও তরল জ্বালানীর পরিবর্তে সর্ব ক্ষেত্রেই সৌর উনানকে ব্যবহার করবে মানুষ।

মেরুজ্যোতি

সূর্য থেকে বিকিরিত রঞ্জনরশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতি বিদ্যুৎ চৌম্বক রশ্মিগুলি প্রবলবেগে ছুটে এসে প্রবেশ করছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। তাছাড়াও ছুটে আসছে সৌরশিখা থেকে উৎপন্ন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি মৌলিক কণিকাগুলি। এরা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের তথা আয়নমণ্ডলের অতি বিরল বায়ুকণাকে আয়নিত করে। অর্থাৎ সেখানকার তড়িৎ নিরপেক্ষ গ্যাসীয় অণু-পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে অণু-পরমাণুরা ধনতড়িৎ সম্পন্ন হয়। অপর দিকে কোন কোন অণু-পরমাণুতে ইলেকট্রনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঋণতড়িৎ সম্পন্ন করে। ধন অথবা ঋণতড়িৎবিশিষ্ট অণু-পরমাণুদেরই আয়ন বলা হয়। আর আয়নে রূপান্তরিত হওয়াকে বলা হয় আয়নিত হওয়া। এইভাবে আয়নিত হওয়ার ফলেই আয়নমণ্ডল সব সময় বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে আছে।

অন্যদিকে দেখা গেছে, পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক। পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরের শেষ সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবীপৃষ্ঠের ৬০০ মাইল ঊর্ধ্বেও পৃথিবীর সম্পর্ক শেষ হয়নি। পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্র প্রায় দু-তিন হাজার মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত প্রসারিত। পৃথিবী যেহেতু একটি চুম্বক—তাই তার উত্তর চৌম্বক-মেরু এবং দক্ষিণ চৌম্বক-মেরু উভয় মেরু বর্তমান। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর এই দুই মেরু ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে একটু ভেতরের দিকে অবস্থান করছে। আর দুই মেরুর মধ্যে বাঁকা বাঁকা চৌম্বক বলরেখা উপরের দিকে বিন্যস্ত হয়ে আছে। একটি দণ্ডচুম্বককে সাদা একখানা কাগজের উপর রেখে তার চারদিকে মিহি লোহার গুঁড়া ছড়ালে চৌম্বক বলরেখা বিন্যস্ত হতে দেখা যায় এবং ধরা পড়ে চুম্বকটির চৌম্বক ক্ষেত্র। ঠিক এইভাবেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রসারিত। তফাৎ শুধু এই, দণ্ডচুম্বক অতিশয় ক্ষুদ্র বলে তার চৌম্বক ক্ষেত্র অল্পস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর পৃথিবী বিশাল আয়তনের হওয়ার জন্য তার চৌম্বক ক্ষেত্র আয়নমণ্ডল ছাড়িয়ে আরও উপরের দিকে প্রসারিত। সূর্য থেকে আগত ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি যখন আয়নমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা ঐ সমস্ত কণিকার গতি নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে কণিকাগুলি চৌম্বক বলরেখার চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে উভয় মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়। যখন প্রবাহিত হয় তখন বিরল

বায়ুকণার সঙ্গে ঘটে সংঘাত এবং এই বায়ুকণা থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করে। বায়ুকণা তখন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং মেরুর দিকে প্রবাহিত হয় বলে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে মেরুর আকাশ। তাই মেরু অঞ্চলে রাত্রিকালে দেখা যায় আকাশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে আছে। আমরা উক্ত ঘটনাকে বলি মেরুজ্যোতি। ইংরাজীতে মেরুজ্যোতিকে বলে "অরোরা বোরিয়ালিস" (Aurora Borealis)।

মেরুজ্যোতিকে প্রতি এগার বছরে বাড়তে দেখা যায়। কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন, এগার বছর অন্তর সৌরশিখার পরিমাণ বাড়ে। তখন অনেক বেশি ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকা ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। তাই এগার বছরে মেরুজ্যোতি প্রবল হয়ে উঠে। এই সময়টায় মেরু থেকে বহু দূরেও দৃষ্টিগোচর হয় মেরুজ্যোতি। মেরুজ্যোতির আলোতে সাধারণত সবুজ, লাল ও হলুদ রঙের প্রাধান্য।

মেরুজ্যোতি উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুতেই দেখা যায়। দক্ষিণ মেরু অত্যন্ত অশান্ত। প্রায়ই সেখানে লেগে থাকে তুষার ঝড়, আর ধস নামে। ভয়ঙ্কর স্থান বলে মানুষ বড় একটা যায় না সেদিকে। এখানে ১ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বরফের আস্তরণ ছড়িয়ে আছে, যার গভীরতা কোথাও কোথাও ৭৫০০ ফুট পর্যন্ত। অপর দিকে উত্তরমেরু অশান্ত হলেও দক্ষিণমেরুর মত ততখানি ভয়ঙ্কর নয়। উত্তরমেরু থেকে অনেকটা দূরে মনুষ্য-বসতি আছে। এখানে দিন রাত্রির ব্যাপ্তিকাল অনেক বেশি। আকাশে মেরুজ্যোতি দেখা যায় বলে মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে রাত্রিকাল গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যেতে পারে না। এখন অবশ্য সভ্য মানুষ সেসব জায়গায় বিদ্যুৎকে বয়ে নিয়ে গেছে, রেল লাইন পাতিয়েছে, এমনকি সভ্যতার সবরকম উপাদানকে ধীরে ধীরে জমা করেছে। উত্তরাঞ্চলের মেরুজ্যোতিকে অরোরা বোরিয়ালিস ও দক্ষিণাঞ্চলেব মেরুজ্যোতিকে অরোরা অস্ট্রেলিস বলা হয়।

সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ হাজার মাইল উপর পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র। সাধারণত ৬০০ মাইল বা তারও কিছু উর্ধ্বের পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা সূর্য থেকে আগত সৌরকণিকাগুলিকে মেরু অভিমুখে প্রবাহিত করায়। কিন্তু এক হাজার থেকে তিন হাজার মাইল উর্ধ্বের চৌম্বক বলরেখা এমনভাবে বিন্যস্ত যে, সেখানে আগত সৌরকণিকাগুলি মেরুর দিকে ছুটে আসতে পারছে না। প্রায় দশ হাজার মাইল উর্ধ্বে এই জাতীয় দ্বিতীয় আর একটি স্তর আছে। এই দুটি স্তরই অতি তীব্র বিদ্যুৎ তেজ সম্পন্ন। তবে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টির তীব্রতা আরও বেশি।

ঊর্ধ্বাকাশে পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী উপরোক্ত দুটি বিশেষ ক্ষেত্র। যেন দুটি বলয় ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সবচেয়ে উপরের বলয়টি সূর্যদেহ থেকে আগত ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকার দ্বারা সৃষ্ট এবং নিম্নের বলয়টি মহাজাগতিক রশ্মি তথা "কসমিক রে"র দ্বারা বিধ্বস্ত অণু-পরমাণুর দ্বারা সৃষ্ট।

পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশের বলয়াকার দুটি বিস্তৃত চৌম্বক ক্ষেত্র একেবারে আধুনিককালে মহাকাশ গবেষণা থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। যাঁরা প্রমাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জেমস ভ্যান অ্যালেন নামে একজন বিজ্ঞানী। প্রথমে ভ্যান অ্যালেনই এই জাতীয় ক্ষেত্রের সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাই তাঁরই নামানুসারে বলয় দুটির নামকরণ করা হয়েছে "ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট।"

পৃথিবীর জল

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, জল একটি মূল পদার্থ। প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় দার্শনিকরাই জলকে মূল পদার্থরূপে কল্পনা করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ তাঁদেরই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলে মনে করে এসেছিল। শেষে ক্যাভেণ্ডিস নামে জনৈক বিজ্ঞানী একদিন একটি বদ্ধ পাত্রে সদ্য আবিষ্কৃত দুই আয়তন হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক আয়তন অক্সিজেন মিশ্রিত করে এবং মিশ্রণের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে দেখলেন, পাত্রের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে। সেদিন অবশ্য ক্যাভেণ্ডিস এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য রসায়ন-বিজ্ঞানী ব্যাপারটাকে ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারেননি। পরবর্তীকালেই উক্ত পরীক্ষা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিশেষে প্রমাণিত হয়, জল আদৌ মূল পদার্থ নয়—সে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগ। অর্থাৎ জলটা হাইড্রোজেনের স্বাভাবিক ও সুস্থিত অক্সাইড—নাম হাইড্রোজেন মনঅক্সাইড।

আয়তন হিসাবে দুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্সিজেনকে নিয়ে ক্যাভেণ্ডিসের মত বিদ্যুতের সাহায্যে যুক্ত করালে যেমন জল উৎপন্ন হয়, তেমনই অ্যাসিড যুক্ত জলকে বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লেষণ করলেও পাওয়া যায় দুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্সিজেন। বিশুদ্ধ জল বিদ্যুৎ পরিবহনে অক্ষম বলে একটু অ্যাসিড যোগ করতে হয়। বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী মর্লে

জলের রাসায়নিক সংযুতি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, জলে এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সঙ্গে প্রায় আট ভাগ ওজনের অক্সিজেন যুক্ত আছে। তবে সূক্ষ্মভাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঠিক তৌলিক সংযুতিও তিনি নির্ণয় করেছিলেন। সেই অনুপাতটি ১ : ৭.৯৩৯৬।

পৃথিবী জন্মের সময় যে আবহমণ্ডলটি লাভ করেছিল, সেই আবহমণ্ডলে ছিল বেশ কিছুটা জলীয় বাষ্প। অর্থাৎ পৃথিবী বস্তুকণা কুড়িয়ে বৃহৎ বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়ে আকর্ষণ শক্তি লাভ করা পর্যন্ত কিছু জলীয় বাষ্প সে অঞ্চলে থেকে গিয়েছিল। পৃথিবীর আকর্ষণের আওতায় পড়ে সেগুলি থেকে গেছে আবহমণ্ডলে। সূর্য থেকে মুক্ত বলয়ে অবশ্য জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যথেষ্টই ছিল। তার ভগ্নাংশমাত্র লাভ করেছে পৃথিবী। বুধ ও শুক্র আপন শরীর গঠন করার পূর্বেই জলীয় বাষ্প তাদের আকর্ষণের সীমা অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল। সৌভাগ্যবতী পৃথিবী একটু সুযোগ পেয়েছিল জলীয় বাষ্পকে বন্দী করতে। সে সুযোগ মঙ্গল আরও বেশি লাভ করেছিল কিন্তু তার ক্ষীণ আকর্ষণ বল ধরে রাখতে পারেনি। অপর দিকে বলয়ে অবস্থিত প্রায় সমূহ জলীয় বাষ্পকে বন্দী করেছে বৃহস্পতি ও শনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য তাদের আবহমণ্ডলের সমূহ জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে বরফ হয়ে আছে। পৃথিবীর মত বৃষ্টিপাত ওদের পৃষ্ঠদেশে হয় না।

জলীয় বাষ্পকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসেনি। কারণ, সে সময় পৃথিবী ছিল অতিশয় উত্তপ্ত। কালক্রমে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শীতল হলে তার আবহমণ্ডলস্থিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ পায় এবং একদিন শুভক্ষণে আকাশের কোণে মেঘ জমে। অবশেষে জলরূপে ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবী সেই প্রথম শীতল জলে স্নান করে উত্তপ্ত দেহ জুড়িয়েছিল।

এমনও কথিত হয়, আদিম পৃথিবী ছিল জলমগ্ন। খুব সম্ভব একদা সেই জলমগ্ন পরিবেশেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল নিম্নশ্রেণীর জীব ও উদ্ভিদ। কোটি কোটি বছর ধরে সেই জলেই চলেছিল জীবদেহের ক্রমবিবর্তন। তারপরে আসে উভচর, স্থলচর প্রভৃতি নানা জীব। অবশেষে লাভ করেছে উন্নত জীব-গোষ্ঠী। কিন্তু আদিম পৃথিবীতে জীবদেহের পরিবেশ ছিল জলের সঙ্গে একাত্ম। তাই হয়ত আজ শত শত কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও পার্থিব জীব ও উদ্ভিদের কাছে জল জীবনস্বরূপ।

পৃথিবী সেদিন জলীয় বাষ্পকে লাভ করেছিল বলেই লাভ করেছে এমন জীব ও উদ্ভিদকে। পৃথিবী নিজ দেহের চারদিকে প্রায় তিন ভাগ স্থান জুড়ে যেমন জলকে রেখেছে, তেমনই পার্থিব জীব ও উদ্ভিদের দেহের একটা বড় অংশই হচ্ছে জল। এই জলের পরিমাণ জীব ও উদ্ভিদদেহে সব সময় সমান থাকে না। যে সময় জীব ও উদ্ভিদ দ্রুত বেড়ে উঠে সেই সময়টাতে দেহে জল থাকে সর্বাধিক। প্রথমে জীবের কথা ধরা যাক। ভ্রূণ অবস্থায় জীবদেহে থাকে শতকরা নব্বুই ভাগ জল। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষের দেহে জলের পরিমাণ প্রায় ৪০ লিটারের কাছাকাছি। আমাদের সক্রিয় পেশীতে কেবল জল থাকে শতকরা ৭৫ ভাগ, সঞ্চিত মেদ-কলায় ৬ থেকে ২০ ভাগ। মানবদেহে যতগুলি কোষ আছে তাদের ভেতর থেকে জলকে নিষ্কাশন করে নিলে পরিমাণটা দাঁড়াবে ১৫ লিটারের মত। জীবদেহের রক্তের আবার প্রধান উপাদান হল জল। বস্তুত রক্তের রসায়ন লবণাক্ত জলের রসায়নের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সদৃশ। রক্তে যদি জল না থাকতো তাহলে দেহে রক্ত সঞ্চালন হতে পারত না। রক্তের জলীয় অংশটা কোন প্রকারে অপসারিত করে নিলে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। জীব তখন আর বাঁচবে না। জীবদেহের অন্যান্য অংশে যথা মস্তিষ্কে, সুষুম্না-কাণ্ডে, লসিকায়ও জলের পরিমাণ বড় কম নয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহে জলের পরিমাণ কমতে থাকে।

সুস্থ শরীর থেকে প্রতিদিন প্রায় দুই থেকে তিন লিটার জল মল-মূত্র ও ঘামের আকারে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হয়। সেই কারণে দেহে ক্ষয়পূরণ করতে হয় জলপানের দ্বারা। তবে একথাও সত্য যে, আমাদের দেহে সবসময় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে তাতেও উৎপন্ন হচ্ছে কিছু কিছু জল।

অন্যদিকে উদ্ভিদ দেহের প্রধান উপাদানও জল। চারা অবস্থায় তাদের দেহে জলের পরিমাণ বেশি থাকে বলে জীবের মতই তারা দ্রুত বাড়ে। মাটি থেকে জলে দ্রবীভূত তরল খাদ্য তারা গ্রহণ করে এবং অতিরিক্ত জলকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়। উদ্ভিদের উক্ত প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রস্বেদন।

জীব ও উদ্ভিদের কথা ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর বস্তুরাশির দিকে তাকালেও জলের প্রাচুর্যই ধরা পড়ে। জল তাই অতি সাধারণ। কোন সহজ কথাকে আমরা তুলনা করতে গিয়ে বলি "জলের মত সহজ"। যদিও জলের ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়। কেবল বলা যেতে পারে একমাত্র মরুভূমি ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রে পৃথিবীতে জল সহজলভ্য। পৃথিবীর তিন ভাগ স্থানে বিরাজ করছে জল, উঁচু পর্বতের চূড়াগুলিতে এবং মেরুদেশে জল বরফের আকারে স্তূপীকৃত, ভূগর্ভে

অদৃশ্যভাবে বিচরণ করছে জলস্রোত, রাসায়নিক উপায়ে যুক্ত হয়ে জল বিদ্যমান নানা খনিজ পদার্থের মধ্যে, জলীয় বাষ্পের আকারে অবস্থান করছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না। আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কখনও বাড়ে আবার কখনও কমে। বাষ্পায়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের জলভাগের উপরের অংশ থেকে যে কোন তাপমাত্রাতে সবসময় জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে বাষ্পায়নের হার হয় দ্রুত। সেই বাষ্প আকাশে ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুর সংস্পর্শে এসে শীতল হয় এবং মেঘের সৃষ্টি করে।

জলীয় বাষ্প উপরে উঠে যাওয়ার একটা কারণ আছে। যখন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়তে থাকে তখন বাতাস আর্দ্র হয়ে পড়ে। এই আর্দ্র বাতাস শুষ্ক বাতাস অপেক্ষা হালকা কেননা একই চাপ ও তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প বাতাসের তুলনায় ৫ : ৮ অনুপাতে হালকা। ফলে একটা পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আর্দ্র ও হালকা বাতাস উপরে ওঠে এবং উপরের শুষ্ক ও ভারী বাতাস নিচে নামে। সেই ভারী বাতাস আবার বাষ্পায়নের ফলে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প লাভ করতে করতে সম্পৃক্ত হয়। তখন আবার তাদের উঠতে হয় উপরে আর উপরের বাতাস পুনরায় নামে নিচে। এইভাবে ওঠা-নামার ফলে আকাশের বহু উচ্চ পর্যন্ত বাতাস জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সূর্যের উত্তাপে আবার তার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। তখন আরও উচ্চে আরোহণ করে। এইভাবে উপরে উঠতে উঠতে তারা বায়ুর নিম্ন চাপ ও তাপ বলয়ে প্রবেশ করে এবং প্রসারিত হয়। প্রসারণের ফলে তাপমাত্রা আরও কমে যায়। এখন তাপমাত্রা কমে গেলে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতাও কমে যায় ও অবশেষে এমন এক তাপমাত্রায় পৌঁছায়, যখন আর সেই তাপমাত্রায় সেখানকার বাতাস সমূহ জলীয় বাষ্পকে ধরে রাখতে পারে না। তখন জলীয় বাষ্প বায়ুতে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে অবলম্বন করে ঘনীভূত হয় এবং ছোট ছোট জলকণার সৃষ্টি করে। এই উপায়ে সৃষ্ট জলকণাগুলো আবার বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়। তখন আমরা তাকে মেঘ বলি। মেঘে যে জলকণা থাকে তার ব্যাস সাধারণত ০·০২ থেকে ০·০৬ মিমি হয়ে থাকে।

আকাশের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন সময় নানা প্রকারের মেঘ দেখা যায়। এক জাতীয় মেঘ ঊর্ধ্বাকাশে কুড়ি হাজার ফুট থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার ফুট তথা

৪ থেকে ১০ মাইলের মধ্যে অবস্থান করে। উক্ত মেঘকে বলা হয় অলক মেঘ বা পালক মেঘ (cirrus cloud)। একে অনেক সময় উচ্চ পর্যায়ের মেঘও বলা হয়। পেঁজা তুলার মত বা পাখীর পালকের মত পাতলা পাতলা সাদা মেঘ। উক্ত মেঘকে আকার অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। সিরাস বা অলক মেঘ, সিরোস্ট্রাটাস বা পালকের মত পাতলা অথচ স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘ এবং সিরোকিউমুলাস বা সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। এই সব মেঘের অধিকাংশই ঝড়ের পূর্বাভাষ প্রদান করে। সাধারণত কোথাও সমুদ্র-বক্ষে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে আকাশের বহু উচ্চে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অতি পাতলা কতকগুলো চওড়া রেখার বা তলের মত মেঘ ভাসতে থাকে অথবা কতকগুলি স্তরে বিভক্ত হয়। সিরোস্ট্রাটাস মেঘে বৃষ্টি হয় না।

ভূপৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার ফুট উর্ধ্বে এবং কুড়ি হাজার ফুটের মধ্যে অর্থাৎ এক মাইল থেকে চার মাইলের মধ্যে সাদা স্তূপীকৃত মেঘ দেখা যায়। মধ্য পর্যায়ের ঐ মেঘকে স্তূপ মেঘ বা cumulus মেঘ বলা হয়। এরাও আবার তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর অল্টোকিউমুলাসকে সূর্যাস্তের আগে অথবা সূর্যোদয়ের পরে পূব ও পশ্চিম আকাশে রাশি রাশি তুলার মত জমা হতে দেখা যায়। এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অল্টোস্ট্র্যাটাস ধূসর বর্ণের স্তরে স্তরে সজ্জিত মেঘ। এই মেঘ থেকেও বৃষ্টি হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর নিম্বো-স্ট্র্যাটাস মেঘ দেখতে অনেকটা কালো কিংবা ধূসর বর্ণের। ঐ মেঘ থেকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।

আকাশের সর্বনিম্ন পর্যায় স্তরের মেঘের নাম জলদ মেঘ এবং ঐ মেঘ থেকেই প্রবল বৃষ্টি হয়। উক্ত মেঘ ভূপৃষ্ঠের উপরে মাত্র এক মাইলের মধ্যে থাকে। ইংরাজীতে ঐ মেঘকে অনেকে Nimbus cloud বলেন। এদের আবার চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা—স্ট্রাটোকিউমুলাস, স্ট্র্যাটাস, কিউমুলাস এবং কিউমুলোনিম্বাস। কিউমুলোনিম্বাস মেঘ ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েকশ' ফুট উপরে থাকে। এই মেঘ ভারী ও ঘন কালো। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রভৃতির সূচনা করে এই মেঘ।

বর্ষাকালে জলদ মেঘ থেকেই বৃষ্টিপাত হয়। জল একবার ভূপৃষ্ঠ থেকে বাষ্পাকারে উঠে যায় উপরে, পুনরায় নেমে আসে বৃষ্টির আকারে। জলের এই রূপান্তর এবং চক্রাকারে পরিভ্রমণ পৃথিবীর বুকে এনে দিয়েছে বিরাট সম্ভাবনা—যা সৌরজগতে অপর কোন গ্রহে নেই। বৃষ্টিবিন্দু মেঘ থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে যখন ধাবিত হয় তখন বায়ুস্তরকে ভেদ করতে হয় বলে অনেক সময়

বৃষ্টিবিন্দু ভেঙ্গে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয় এবং পুনরায় বাষ্পরূপে উপরে উঠে। উক্ত কারণে মেঘ তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার প্রত্যক্ষ ফল বজ্র ও বিদ্যুৎ। আগ্নেয়শিখারূপে তড়িদ্‌ক্ষরণের ফলে বজ্র ও বিদ্যুৎ-এর সৃষ্টি হয়, তা একই মেঘের মধ্যে, এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে, মেঘ থেকে ভূমিতে তড়িদ্‌ক্ষরণ যে কোনটি হতে পারে। অত্যন্ত মারাত্মক হলেও বজ্রপাত উপকারও কম করে না। বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনকে যুক্ত করে পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীর বুকে। উর্বর করে মাটিকে।

অপরদিকে জলীয় বাষ্প কেবল আকাশ থেকে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে না, শরতের শিশির, শীতের কুয়াসা ও তুষারাপাত এবং বসন্তের শিলাবৃষ্টির আকারেও নামে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতাও নির্দিষ্ট। তাপমাত্রা বাড়লে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বাড়ে আবার তাপমাত্রা কমলে সেই ক্ষমতা কমে যায়। দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রি যখন দীর্ঘ হয় তখন দিনের বেলায় পৃথিবী যে তাপ গ্রহণ করে রাত্রিকালে সে তাপ তো বর্জন করেই অধিকন্তু আরও শীতল হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে পৃথিবী সংলগ্ন বায়ুস্তরও হয় শীতল। বায়ু তখন জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা হারায় এবং বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গাছের পাতা, ঘাস ইত্যাদির উপর জমা হয়। একে আমরা শিশির বলি। শিশির জলীয় বাষ্প শুধু বায়ু থেকে নয়, ভূমি থেকেও সংগ্রহ করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যতাপে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা পুনরায় লাভ করে, ভূমিও উত্তপ্ত হয়। তখন শিশির আর থাকে না। বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুতে মিশে যায়।

কুয়াসার সৃষ্টি হয় অনেকটা মেঘ সৃষ্টির মতই। তবে কুয়াসার সৃষ্টি হয় বায়ুর নিম্ন স্তরে আর মেঘ সৃষ্টি হয় উপরে। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুস্তরের তাপমাত্রা কমতে কমতে যদি এমন তাপমাত্রায় আসে, যখন শীতকালে জলীয় বাষ্প কম থাকা সত্ত্বেও বায়ু আর জলীয় বাষ্পকে ধরে রাখতে পারে না—তখন বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প ভাসমান ধূলিকণাকে অবলম্বন করে ঘনীভূত হয়। এই অবস্থাকে আমরা কুয়াসা বলি। সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়ে। তখন বায়ু পুনরায় জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা লাভ করে। এই কারণে দুপুরের আগেই কুয়াসা কেটে যায়। আবার সকালের দিকে যখন তাপমাত্রা কমতে থাকে তখন পুনরায় কুয়াসার সৃষ্টি হয়।

খুব ঠাণ্ডায় বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের কণায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং বায়ুমণ্ডলে ভাসতে থাকে। সেই কণাগুলি যখন

আকারে বড় হয় তখন ওজনে ভারী হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডল আর এদের ধরে রাখতে পারে না। ঝির ঝির করে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে ভূপৃষ্ঠে। এই ঘটনাকে বলা হয় তুষারপাত। মেরু অঞ্চলে প্রায় সব সময় এবং শীতকালে পাহাড়ী অঞ্চলে তুষারপাত ঘটে। যেন পাউডার পেঁজা তুলার মত নেমে আসে আকাশ থেকে।

বৃষ্টির ফোঁটা যখন আকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে তখন অত্যধিক ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে যদি আসে তাহলে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জমে বরফের টুকরায় পরিণত হয়। সেগুলো হয় ওজনে ভারী। উপর থেকে নিচে নামার সময় চতুষ্পার্শ্ববর্তী জলীয় বাষ্প তাদের গায়ে জমে আকার আরও বাড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি সহ ছোট বড় বরফের টুকরোরও বর্ষণ হয়। উক্ত ঘটনাকে বলে শিলাবৃষ্টি।

মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয়। মেঘের জলকণাগুলো ভাসতে ভাসতে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে হতে আকারে বেড়ে ওঠে এবং বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয়। তখন মেঘ আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। বৃষ্টির আকারে নেমে আসে নিচের দিকে। কিন্তু এই সময় জলকণাগুলি যদি কোন শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে পুনরায় তারা বাষ্পীভূত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। অপরদিকে যদি আর্দ্র বায়ুস্তর ভেদ করে আসে তাহলে বাষ্পীভূত হওয়ার সুযোগ পায় না অধিকন্তু জলের ফোঁটাগুলো আরও বড় হয়ে ওঠে। তাই জলবিন্দুরা আকাশ থেকে মাটিতে নামার সময় এক ভাঙ্গা-গড়া প্রণালীর ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। অর্থাৎ কখনও ছোট ছোট বিন্দু বড় বিন্দুর আকার গ্রহণ করে আর বড় বিন্দু ভেঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত হয়। বড় বিন্দু ভেঙ্গে ছোট ছোট বিন্দুতে রূপান্তরিত হওয়া বা উষ্ণ বায়ুস্তরের সংস্পর্শে পুনরায় বাষ্পে পরিণত হওয়ার ফলেই বোধ হয় তড়িতাধানের পৃথকীকরণ হয়। তখন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় এবং কড় কড় শব্দে বাজ পড়ে। জোরে বৃষ্টি নামার পূর্বে এবং পরে সাধারণত ঐ কারণেই বাজ পড়ে।

জলের রকমফেরে কোনটি স্বাদে ভাল, আবার কোন কোনটি মুখে ধরা যায় না। অন্যদিকে সমুদ্রের জল আবার অতিরিক্ত লবণাক্ত। আসলে জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব পদার্থের জন্যই জল বিভিন্ন স্বাদযুক্ত হয়, জল উত্তম দ্রাবক। বহু পদার্থকে সে দ্রবীভূত করতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জলের কোন স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধ নেই। দেখতেও খুব স্বচ্ছ। অপর পক্ষে বিশুদ্ধ জল তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী। তাই জলকে তড়িৎদ্বারা বিশ্লেষণ করতে গেলে একটুখানি অ্যাসিড যোগ করতে হয়।

জল তরল পদার্থ। কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তনে তার আকারের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত ৭৬০ মিলিমিটার বায়ুমণ্ডলের চাপে এবং O ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জল কঠিন বরফে রূপান্তরিত হয়। উক্ত তাপমাত্রাকে বলা হয় জলের হিমাঙ্ক। আবার ঐ ৭৬০ মিলিমিটার বায়ুমণ্ডলের চাপে এবং ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয়। স্বাভাবিক বায়ু চাপে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাই জলের স্ফুটনাঙ্ক।

জল তাই পৃথিবীতে তিন আকারেই থাকে—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। অপরদিকে বায়ুচাপের পরিবর্তনের ফলে জলের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কেরও পরিবর্তন হয়। পর্বত শীর্ষে—যেখানে বায়ুর চাপ কম, সেখানে জলকে বাষ্পীভূত করতে হলে জ্বালানীর প্রয়োজন হয় কম। অর্থাৎ কম তাপমাত্রায় সেখানে জল বাষ্পে পরিণত হয়। হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের মাথায় জল ফোটে মাত্র ৭১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। কৃত্রিম উপায়ে চাপ বাড়িয়ে জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরেও আনা যায়। প্রেসার কুকারের কথা ধরা যেতে পারে। ওতে জল রেখে তাপ প্রদান করতে থাকলে বায়ু ও বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের অনেক উপরে ওঠে। পর্বতের উপর রান্না করতে গেলে বায়ুর চাপ কম বলে তরিতরকারি, চাল, ডাল ভালভাবে সেদ্ধ হয় না। তাই সেখানে প্রেসার কুকারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

বায়ুর মত জলও সবদিকে চাপ দেয়। কেবল জল নয়, সব তরল পদার্থই চাপ প্রদান করে। পাত্রের কিছু অংশ জলে পূর্ণ করলে জল উক্ত পাত্রের গাত্র ও তলদেশে যে চাপ প্রদান করে উচ্চতা বাড়ালে সে চাপের পরিমাণ বাড়ে। বর্তমানে তাই নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে, গতিকে রুদ্ধ করে যে জল সঞ্চয় করা হয় তারই প্রচণ্ড চাপে উৎপন্ন করা হয় জলবিদ্যুতকে।

তরল পদার্থ হিসাবে জল সহজলভ্য বলেই যে কোন তরলের ধর্ম পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা জলকে মানদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করে থাকি। সাধারণত ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক ঘন সেন্টিমিটার বা এক সি. সি. জলের ওজনকে এক গ্রাম একক ধরা হয়। সম আয়তন কঠিন বা তরলের ওজনের তুলনায় ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাবিশিষ্ট জলের ওজন যত গুণ ভারী কিংবা হালকা হয়, তাকেই ধরা হয় পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব। তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে দুটি ভরের অনুপাত ছাড়া আর কিছুই নয়। জলের তুলনায় পারদ ১৩·৬ গুণ ভারী—সেই কারণে পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ধরা হয় ১৩·৬। আপেক্ষিক গুরুত্ব দুটি ভরের অনুপাত বলে ওর কোন একক নেই। অন্যদিকে ৪ ডিগ্রি

সেন্টিগ্রেডে জলের ঘনত্ব অপরাপর উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি বলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐ ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

তাপের প্রভাবে সব তরলেরই আয়তন প্রসারিত হয়। কিন্তু জলের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে। দেখা গেছে, ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার উপরের তাপমাত্রায় জলের আয়তন বাড়ে এবং তাপ হ্রাস করলে আয়তন কমে। আবার ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে জলকে শীতল করলে জলের আয়তন বাড়ে। শেষ পর্যন্ত O ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আয়তন বাড়তে বাড়তে বরফে পরিণত হয়ে যায়। তখন তার আয়তন মূল জলের একদশমাংশ বৃদ্ধি পায় এবং জলের উপরে ভাসতে থাকে (বরফের ঘনত্ব হল ০.৯১৬৬)। ঐ কারণে শীতপ্রধান দেশগুলিতে নদী, সাগর, হ্রদ প্রভৃতির জল বরফে পরিণত হয়ে গেলেও তলায় ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ঘন জল থেকে যায় এবং ঐ কারণেই সে সব জায়গায় জলচর জীবরা বেঁচে থাকে। শীতকালে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জলভাগের উপরের জলও শীতল হয়ে ভারী হয়। তখন নিচে নেমে পড়ে এবং নিচের হালকা ও উষ্ণ জল উপরে উঠে। এইভাবে জলে একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। যখন এইভাবে ঠাণ্ডা হতে হতে জলের উষ্ণতা ৪ ডিগ্রিতে নেমে আসে তখন তলার ভারী জল আর উপরে উঠতে পারে না। অপরদিকে উপরের জলটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে হতে O ডিগ্রিতে নেমে আসে এবং বরফে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বরফ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের আয়তন বৃদ্ধি পায়—একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ কারণবশতঃ শীতকালে শীতপ্রধান দেশ সমূহে জল পরিবহনের নলকে জলে পূর্ণ রাখলে নল ফেটে যায়। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টিকালে যে জল জমা হয়, সেগুলি শীতকালে বরফে পরিণত হওয়ায় আয়তনে বাড়ে এবং প্রচণ্ডভাবে চাপ দেয়। চাপের ফলে অনেক সময় পাহাড়ের গায়ে ফাটল সৃষ্টি হয়। সেই ফাটল আবার কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির জন্মদান করে।

বৃষ্টির জল যখন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখন বায়ুমণ্ডল থেকে নিয়ে আসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা, গ্যাসকণা, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন ও অ্যামোনিয়াকে। এদের মধ্যে যারা দ্রবণীয় তারা অল্প বিস্তর দ্রবীভূত হয় বাকিরা জলে সিক্ত ও ভারী হয়ে বৃষ্টির সাথে সাথেই ভূপতিত হয়। তাই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃতিকে বেশ শান্ত ও পরিষ্কার দেখায়। কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় প্রকৃতিকে ধূলি ধূসরিত দেখা যায়। মনে হয় পাতলা এক ধূলির আবরণে ঢেকে গেছে দূরের গাছপালাগুলি। তারপর যখন বৃষ্টি আসে তখন ধূলাবালি থিতিয়ে নেমে আসে মাটিতে। বৈশাখের দিকে বৃষ্টির জল তাই বেশ

ঘোলাটে। এমনকি সেই বৃষ্টিতে ভিজে এলে গায়ের জামা কাপড়ে ধূলার আস্তরণ পড়ে।

জল উত্তম দ্রাবক বলে বৃষ্টির জল যখন মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যায় তখন মাটিতে মিশে থাকা কতকগুলি যৌগিক পদার্থকে দ্রবীভূত করে নেয়। সেই সব যৌগিক পদার্থের মধ্যে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড, সালফেট, কারবনেট, নানা খনিজ পদার্থ এবং লৌহের যৌগিকই প্রধান। অন্যদিকে বাতাস থেকে বৃষ্টির জল কারবন ডাইঅক্সাইডকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে বলে মাটির ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সহজে দ্রবীভূত হয়। এবং এই দুই ধাতুর বাইকারবনেট লবণ গঠন করে। বৃষ্টির জল আবার গড়িয়ে গড়িয়ে নদীতে এবং পরে সাগরে জমা হয়। বছরের পর বছর নদী ভূপৃষ্ঠের সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণকে জমা দিচ্ছে সাগরে। এইভাবে জমা পড়তে পড়তে সাগরজলে বর্তমানে ওদের পরিমাণ প্রায় সত্তর ভাগের মত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে আবার সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি জমা হচ্ছে। উক্ত কারণে সমুদ্রের জল লবণাক্ত। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আদিতে সমুদ্রের জল আদৌ লোনা ছিল না। আবার ভবিষ্যতে সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ এতখানি বেড়ে যাবে যে, মরু সাগরের জলের মত সাঁতার না জানলেও মানুষ ডুববে না। কোন কোন বিজ্ঞানী তাই সমুদ্রজলে নুনের পরিমাণ নির্ণয় করে এবং প্রতি বছর কী পরিমাণ নুন সাগরে জমা পড়ছে—তার হিসেব করে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করতে চান। বিজ্ঞানী রুবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ অবশ্য একথাই প্রমাণ করেছে যে সহস্র সহস্র বছর ধরে ভূমির লবণ বাহিত হয়ে সাগরে পড়লেও সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত লবণের উপাদানগত ও পরিমাণগত তারতম্য বিশেষ কিছু ঘটেনি।

জলে বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ ও ধাতব লবণ দ্রবীভূত থাকলে জল খর হয়। অর্থাৎ এই ধরনের জলে সাবানের ফেনা ভালভাবে হয় না। সাগরের জল, কূপের জল, প্রস্রবণের জল প্রভৃতি খরজল। প্রস্রবণের জল মাটির ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করে মাটির বহু যৌগিক পদার্থকে সঙ্গে নেয়। এই জলে সাবান বেশি খরচ হয় ও কাপড়-চোপড় ভাল পরিষ্কারও হয় না। খরজল বয়লারের তলায় পুরু আস্তরণ সৃষ্টি করে এবং সেই আস্তরণ তাপের কুপরিবাহী। ঐ কারণে খরজলকে বয়লারে ব্যবহার করলে বয়লার ফেটে যায়। তাই শিল্পেও ব্যবহার করা যায় না খরজলকে। চামড়া ভালভাবে ট্যান করা যায় না বলে চর্মশিল্পেও ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া খরজলে খাদ্যবস্তু ভালভাবে সেদ্ধ হয় না।

পানীয় হিসাবেও সব খরজল উপযুক্ত নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে খরজল মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী।

খরজল দু'রকমের—অস্থায়ী খরজল ও স্থায়ী খরজল। যে জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের বাইকারবনেট লবণ দ্রবীভূত থাকে তাকে বলা হয় অস্থায়ী খরজল এবং যে জলে উক্ত ধাতুদ্বয়ের ক্লোরাইড অথবা সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকে তাকে বলা হয় স্থায়ী খরজল। কখনও কখনও অস্থায়ী খরতাকে "কারবনেট হার্ডনেস" এবং স্থায়ী খরতাকে "নন কারবনেট হার্ডনেস" বলা হয়। অবশ্য ইংরাজীতে খরজলকে বলা হয় "হার্ড ওয়াটার"। তেমনই অস্থায়ী খরতা ও স্থায়ী খরতার নাম যথাক্রমে টেম্পোরারি হার্ডনেস ও পার্মানেণ্ট হার্ডনেস।

খরজলকে বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার করা যায় না বলে তাকে নানাভাবে শোধন করতে হয়। তন্মধ্যে জলকে ফুটিয়ে ব্যবহার করার রীতিই অধিক প্রচলিত। জলকে ফুটিয়ে ফেললে জলের অস্থায়ী খরতা দূর হয়, জলের জীবাণুরা নষ্ট হয়, দ্রবীভূত গ্যাস দূরীভূত হয়, ফুটিয়ে থিতাতে দিলে কিছু কিছু কাদা-বালি প্রভৃতি মুক্ত হয়। কিন্তু বহু অদ্রবীভূত ময়লা এবং দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট লবণ থেকে মুক্ত হয় না। অধিকন্তু মুক্ত হয় না জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থগুলি। ফিল্টার পদ্ধতিতে বালির স্তরের ভেতর দিয়ে জলকে চুইয়ে আনলে সব রকমের ময়লা, কিছু কিছু জীবাণু, জৈব ও অজৈব পদার্থগুলি অনেকাংশে মুক্ত হয় সত্য কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ হয় না। সেই তুলনায় বালি ও কাঠকয়লা গুঁড়ার দুটি স্তরের ভেতর দিয়ে চুইয়ে আনলে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। তাই বড় বড় শহরে জল সরবরাহের জন্য উক্ত পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এবং জলকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য যোগ করা হয় অল্প ক্লোরিন। জলে চুন দিলেও অস্থায়ী খরতা দূরীভূত হয় এবং জলে ফটকিরির গুঁড়া যোগ করলে জীবাণু ও অনেক জৈব পদার্থ দূরীভূত হয়। আর খরতাও কমে যায় অনেকাংশে।

পারমুটিট নামক একটি পদ্ধতি আছে—যার দ্বারা জলের স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ধরনের খরতাকে দূর করা সম্ভব। জিওলাইট নামে একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। উক্ত খনিজটি সোডিয়াম অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও বালির একটি যৌগিক। যখন ঐ জিওলাইটের স্তরের ভেতর দিয়ে জলকে পাঠান হয় তখন জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর বাইকারবনেট, সালফেট ও ক্লোরাইড লবণের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। ঐ বিক্রিয়ার পদ্ধতি অনেকটা বিনিময় পদ্ধতির মত বলা যেতে পারে। অর্থাৎ পারমুটিট

বা জিওলাইটে দ্রাব্য সোডিয়াম লবণের সঙ্গে খরজলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণের ক্রিয়ায় অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সিলিকেট গঠন করে পারমুটিটে পরিণত হয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

পারমুটিট পদ্ধতির মূল কথা ব্যক্ত হলেও অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উক্ত পদ্ধতিতে পারমুটিট কিছুদিন ব্যবহারের পর অকেজো হয়ে পড়ে। তখন ঐ পারমুটিটের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে লবণ জলকে প্রবাহিত করালে পারমুটিট পূর্বাবস্থা ফিরে পায়।

জল বিশোধনের সর্বাধুনিক পদ্ধতিটির নাম "আয়ন বিনিময় রজন" প্রণালী (Ion Exchange Resins)। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হচ্ছে। উক্ত পদ্ধতিতে শোধিত জল অনেকটা পাতিত জলের মত বিশুদ্ধ হয়। তাই বিভিন্ন শিল্পে এবং ওষুধের কারখানায় পদ্ধতিটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আয়ন বিনিময় প্রণালীতে দুটি স্তরে জলকে ফিলটার করা হয়। প্রথম স্তরে থাকে হাইড্রোজেন বিনিময়কারী রজন। এই স্তর-জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের আয়ন গ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্তরে থাকে বেসিক রজন। সাধারণত অ্যামাইন ফরমালডিহাইড রজনকে ঐ দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয়। জলে দ্রবীভূত ক্লোরাইড ও সালফেট আয়নগুলিকে উক্ত স্তর গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আয়ন বিনিময় প্রণালীতে সমুদ্রজলকে ব্যাপকভাবে বিশোধিত করা হয়েছিল।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও জলের খরতা দূরীকরণের আরও কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পদ্ধতিগুলির মধ্যে ইলেকট্রোডায়ালিসিস পদ্ধতি ও কলগন পদ্ধতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয়ন বিনিময় পদ্ধতির মতই ইলেকট্রো-ডায়ালিসিস পদ্ধতির জল বিশুদ্ধ হয় এবং ধোপাখানায় ও বয়লারে ব্যবহৃত জলের জন্য পরবর্তী পদ্ধতিতেই বিশোধন করা হয়।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাতিত জলকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমে জলকে বাষ্পীভূত করা হয় এবং সেই বাষ্পকে পুনরায় শীতল করে প্রস্তুত করা হয় পাতিত জল। এই জল শুদ্ধ হলেও পানের অযোগ্য। ইনজেকশনে যে জল ব্যবহার করা হয় তাকে আবার বিশেষ উপায়ে পাতিত করতে হয়। প্রথমে জলের সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যোগ করে জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। পরে পাতিত করা হয়। পাতিত জলকেও পুনঃপাতিত করতে হয়। পাতন করা কালে যে সমস্ত কাচের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেগুলির মধ্যে যাতে ক্ষারদোষ না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে

লক্ষ্য রাখা হয়। অবশেষে বীজাণু সংক্রমণ রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে পাতিত জলকে বিশেষভাবে প্রস্তুত কাচ নলে ভর্তি করে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সাধারণত গ্রামে গঞ্জের মানুষ নদী ও পুকুরের জলকে সাধারণ কাজে ব্যবহার করে এবং পানীয় হিসাবে গ্রহণ করে নলকূপের জলকে। শহরে জল সরবরাহ করা হয় নদীর জলকে বিশোধিত করে। কিন্তু পুকুর ও নদীর জল নানা কারণে দূষিত হয়। তবে বায়ুপ্রবাহ ও সূর্যকিরণ জলকে কিছুটা দোষমুক্ত করে। ফাঁকা মাঠে পুকুরের জল হঠাৎ দূষিত হতে পারে না। আজকাল কোন কোন শহরে জলকে সূর্যকিরণের দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে পানীয়রূপে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট নলের মধ্যে জল রেখে সেই জলকে চাপ দিয়ে ছিদ্রপথে বার করান হয়। তখন জলের যে সূক্ষ্ম ধারাগুলি বেরিয়ে আসে সেগুলিকে অক্সিজেন ও সূর্যকিরণের দ্বারা প্রভাবিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে জল জীবাণুমুক্ত তো হয়ই অধিকন্তু স্বাদেও হয় ভাল। অন্যদিকে জলবাহিত রোগের সংক্রমণ অনেকাংশে রোধ করা যায়।

বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সাধারণ জলে কিছু কিছু ভারী জলও থাকে। ভারী জল অর্থে ভারী হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে যে জল গঠন করে তাকেই বুঝায়। অন্যদিকে ভারী হাইড্রোজেন আবার সাধারণ হাইড্রোজেনের সঙ্গে খুব কম পরিমাণে মিশে থাকে এবং ভারী হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভার সাধারণ হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ বা তিন গুণ। সেই হিসাবে সাধারণ জলের আণবিক ওজন ১৮ কিন্তু ভারী জলের আণবিক ওজন ১৯ বা তদপেক্ষা বেশি। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে ভারী জল হল সেই জল যাতে deuterium (D)-এর পরিমাণের আধিক্য ঘটেছে। deuterium হল হাইড্রোজেনের আইসোটোপ বা রূপভেদ, এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়নের সংখ্যা ২, হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তা ১। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ প্রোটন বা নিউট্রনকেই নিউক্লিয়ন নামে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানী লুইস প্রমাণ করেছেন, জলের প্রতি ৪৫০০ অণুতে মাত্র একটি করে ভারী জলের অণু থাকে। পরবর্তীকালে আরও প্রমাণিত হয়েছে, টম্যাটো, আনারস প্রভৃতি ফলে এবং আখের রসে এমনকি ডাবের জলেও ভারী জলের অণু বিদ্যমান। মাতৃস্তন্যেও ভারী জলের অণুর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। প্রাকৃতিক জলে অল্প পরিমাণে ভারী জল থাকলেও কোন কোন জায়গার জলে, যেমন মেরু সাগরের জলে এর পরিমাণ থাকে অনেক বেশি।

ভারী জলের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ জলের আপেক্ষিক

গুরুত্ব ১ কিন্তু ভারী জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'১০৭৬৪। সাধারণ জলের হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে ০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথচ ভারী জলের হিমাঙ্ক ৩'৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও স্ফুটনাঙ্ক ১০১'৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তড়িৎ বিশ্লেষণের দ্বারা সাধারণ জলকে অতি সহজে বিয়োজিত করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু ভারী জল তড়িৎ দ্বারা বিয়োজিত হয় না। তাই সাধারণ জলে যদি ভারী জলের অণু থাকে তাহলে তাকে তড়িৎ দ্বারা বিশ্লেষণ করলে এক সময় সমূহ জলই বিয়োজিত হয়ে যায়। অবশেষরূপে পড়ে থাকে কেবলমাত্র ভারী জলের অণু।

বর্তমানে ভারী জলের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। কারণ, ভারী জল থেকে ভারী হাইড্রোজেনকে সংগ্রহ করার সুবিধা যথেষ্ট। ভারী হাইড্রোজেনকে বিভাজিত করলে যে প্রচণ্ড তাপশক্তির উদ্ভব হয়, তার দ্বারা একদিকে যেমন প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় অপরদিকে তেমনই সম্ভব হচ্ছে সেই প্রচণ্ড তাপকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা। আমরা জানি, আজকাল কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় পরমাণুকে। উক্ত কাজে একটা বড় উৎস হল ভারী জল। পৃথিবীর বহু দেশ এখন জলকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করার পর যে ভারী জল অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে সংগ্রহ করছে ভারী হাইড্রোজেনকে। উদাহরণ-স্বরূপ আমাদের দেশে পাঞ্জাবে গোবিন্দসাগর জলাধারের জল থেকে উক্ত উপায়ে ভারী হাইড্রোজেনকে পৃথক করে বোম্বাইতে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং সেখানে ওকে পারমাণবিক শক্তিশিল্পে ব্যবহারের উপযোগী করা হচ্ছে। জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকেও নষ্ট করা হয় না। অক্সিজেনকে চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং হাইড্রোজেনকে বায়ুর নাইট্রোজেনের সঙ্গে হেবার পদ্ধতিতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে অ্যামোনিয়াকে। এই অ্যামোনিয়া থেকে উৎপন্ন হচ্ছে সার।

জলের প্রধান উৎস সমুদ্র। সমুদ্রের গভীরতা সমুদ্রতল থেকে ছয় মাইল কি তারও বেশি বিস্তৃত। সেই সমুদ্রজলেই পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্যলবণ, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড, ক্যালসিয়াম কারবনেট প্রভৃতি হরেক রকমের লবণ এবং স্বল্প পরিমাণ আয়োডাইড। তাই বহু সম্পদের অধিকারী রত্নাকর—সমুদ্র। মানুষ তার সমূহ রত্নের সন্ধান এখনও পর্যন্ত ঠিকমত লাভ করতে

পারেনি। অপরদিকে যাদের সন্ধান লাভ করেছে তাদেরও কাজে লাগাতে পারেনি ভালভাবে।

সমুদ্রজলে নুনের পরিমাণ সর্বাধিক অর্থাৎ প্রতি লিটারে প্রায় ২৮ গ্রাম নুন দ্রবীভূত আছে বলে নুনটাকেই সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলি নিষ্কাশন করছে। আগে জ্বালানীর সাহায্যে বয়লারে রাখা সমুদ্রজলকে বাষ্পীভূত করে নুন সংগ্রহ করা হতো এখন সংগ্রহ করা হয় সূর্যতাপে সমুদ্রজলকে ঘনীভূত করে। নুন থেকে আবার উৎপন্ন হচ্ছে কাপড়কাচা সোডা, কস্টিক সোডা, সোডিয়াম সালফেট, ধাতব সোডিয়াম, সোডিয়াম বাই কারবনেট প্রভৃতি। অপরদিকে ধাতব সোডিয়াম ও কস্টিক সোডা প্রস্তুত করতে গিয়ে উপজাত হিসাবে লাভ করা হয় ক্লোরিণ। কাচ, কাগজ, ওষুধপত্র, সাবান, নানা শিল্পে এদের ব্যবহার যথেষ্টই। তাই যে দেশ সমুদ্রজল থেকে যত নুন নিষ্কাশন করতে পারছে ততই সে দেশ শিল্পে উন্নত হচ্ছে।

কোন কোন দেশ সমুদ্রজল থেকে ম্যাগনেসিয়ামকেও পৃথক করছে। সূর্যতাপে সমুদ্রজলকে গাঢ় করে, তা থেকে নুনকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার পর যে জলটা অবশেষ রূপে থেকে যায় তাতে জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেট যোগ করলে ম্যাগনেসিয়ামটা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট বা ইপসাম লবণরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়। সমুদ্রের বেলাভূমির কাছাকাছি স্থানে ঢেউ বেশি। সেই ঢেউ থেকে অনেক দেশ আবার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও সেই পদ্ধতি সম্ভব হয়নি। সম্ভব হলে উপকূলবর্তী বিশাল এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হতো।

বিজ্ঞানে অগ্রসর পৃথিবীর কয়েকটি দেশ সমুদ্রজলকে অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। কেউ চেষ্টা করছে স্বল্প ব্যয়ে সমুদ্রজল থেকে পানীয় জল উৎপাদন করতে। আবার কোন কোন দেশ সমুদ্রজলকে বাষ্পীভূত করে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানর জন্যও বদ্ধপরিকর। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নাকি এই অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন। তবে ব্যয়-বাহুল্যহেতু পদ্ধতিটিকে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

জল না হলে আমাদের এক মুহূর্তও চলে না। পানীয়রূপে তো বটেই, ধৌত করাব কাজে, ফটোগ্রাফীতে, ওষুধশিল্পে, কলকারখানার কাজে, দ্রাবক হিসাবে, রাসায়নিক বিশ্লেষণে, রান্নার কাজে, সর্বত্রই জলের প্রয়োজন হয়। মোটকথা, নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে জল ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আমাদের শরীরের আবার প্রধান উপাদান জল। ৫৫ পাউণ্ড ওজনের কোন ব্যক্তির

শরীরের ৪৮½ পাউণ্ড-ই কেবল জল, বাকি ৬½ পাউণ্ড অন্যান্য শক্ত জিনিস। দেহের জলীয় অংশের শতকরা পাঁচ ভাগ কমে গেলেই আমাদের দেহের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। শতকরা ২০ ভাগের মত কমে গেলে কর্মদক্ষতা আদৌ থাকে না এবং মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। জলের অপর নাম তাই জীবন। হাতের কাছে সব সময় জলকে আমরা পাচ্ছি বলে জলের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এবং মরুভূমিতে যারা যায় তারাই একমাত্র উপলব্ধি করে জলের গুরুত্ব।

জল অতি সাধারণ পদার্থ। কিন্তু তার অবদানের তুলনা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কালক্রমে পৃথিবী ওকে লাভ করতে পেরেছিল বলে এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তার পরিবেশ এবং এত সৌন্দর্যের আকর সে। যদি জলকে সে লাভ না করতো, তাহলে মহাকাশের কোটি কোটি ঊষর মরুসদৃশ জ্যোতিষ্কের মতই উত্তপ্ত অথবা অতি শীতল দেহটাকে নিয়ে চিরকালই ঘুরে বেড়াত। পৃথিবীর মাটি, হাওয়া ও আলোর মতই পৃথিবীর জল অপরিহার্য উপাদান। এই চারটির যে কোন একটির অভাব হলে কোন প্রকার জীব ও উদ্ভিদজগৎ সম্ভব হতো না।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

এই যে সুন্দর পৃথিবী—যার অঙ্গে অঙ্গে এত রূপ, এর নদনদী, গিরি, সিন্ধু, মরু, বন-উপবন, বিচিত্র জীব ও উদ্ভিদজগৎ, এরা কী চিরকাল ধরে বিরাজ করবে পৃথিবী-পৃষ্ঠে? অনন্তকাল ধরে কী পৃথিবী সূর্য পরিক্রমা করবে? ভবিষ্যতে কী কোন ব্যতিক্রম আসবে না? পরিবর্তন কী হবে না পৃথিবীর মাটি, পৃথিবীর বায়ু, পৃথিবীর আলো এবং পৃথিবীর জলের? পৃথিবীর দৈহিক পরিবর্তনও কী আসতে পারে না?

এই ধরনের কতই না প্রশ্ন আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে। সবার মন ছুটে যেতে চায় ভবিষ্যতের পানে। সেই সঙ্গে মানুষের এই অপ্রতিহত জয়যাত্রার পরিণাম যে কী সে সম্বন্ধেও ভাবতে ইচ্ছা করে।

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসটার দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষের অপ্রতিহত প্রভাব চিরকাল ধরে চলছে না। এককালে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করতো কেবল কীটেরা। তারপর আসে জলজন্তুদের আমল। ডাঙায় রাজত্ব

করতো আকাশ-ছোঁয়া বৃক্ষশ্রেণী। সেদিন গত হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হল অতিকায় সরীসৃপের দল। এবার চললো তাদের রাজত্ব। কিন্তু কালের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করতে এরাও পারল না। হারিয়ে যেতে হল চিরতরে। অবশেষে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে একদিন আবির্ভূত হল মানুষের পূর্বপুরুষ। হয় এক লক্ষ অথবা দেড় লক্ষ বছর পূর্বে সে এসেছে কিন্তু রাজত্ব তাদের শুরু হয়েছে মাত্র হাজার দশেক বছর—যা পৃথিবীর বয়সের কাছে অতীব নগণ্য। কালের গতিতে হয়ত এই মানুষও যাবে হারিয়ে অথবা তার দেহমনে আসবে পরিবর্তন। লক্ষ বছর পরে আজকের মানুষ সেদিনের উন্নত জীবের গবেষণার বিষয়বস্তু হবে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে কোন বিরাট রকমের পরিবর্তন না এলে মনুষ্য-সভ্যতার দুর্বার গতি রোধ করে এমন সাধ্য কার ? দুর্যোগ যদি না আসে তাহলে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন টিকে থাকবে মানুষ। হয়ত আজকের মানুষের সঙ্গে সেদিনের মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, চাল-চলনের কোন সামঞ্জস্য থাকবে না।

কিন্তু এই পৃথিবীটা টিকবে কতকাল ?

এর উত্তরে বলা যায়, পৃথিবীর জীবনের মূল উপাদানগুলি যতকাল টিকে থাকবে ততকাল ধরে বিরাজ করবে পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদজগৎ। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, ধস নামবে, আগ্নেয়গিরি-ভূমিকম্প-জলোচ্ছ্বাস হবে। তারই ফলে এক একটি বিস্তীর্ণ এলাকার জীব ও উদ্ভিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। চলতে থাকবে ভাঙ্গাগড়ার কাজ। অপরদিকে ব্যাপকভাবেও ধ্বংস আসতে পারে। তবে সব রকমের ধ্বংসই আসবে সাময়িকভাবে। পুরাতনের উপর ভিত্তি করে পুনরায় সৃষ্টি হবে নতুন জীব ও উদ্ভিদজগৎ। তবে পৃথিবী কী ধ্বংস হবে না কোন কালে ?

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর ভাগ্যটাও একসূত্রে বাঁধা। জীব ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের উপযোগী পৃথিবীর সবকিছু বজায় থাকলেও সূর্য ব্যতীত পৃথিবী অন্ধকার! অর্থাৎ পৃথিবীর সকল শক্তির মূল উৎসই হচ্ছেন সূর্যদেব। যতকাল পৃথিবীর আকাশে সূর্য থাকবেন ততদিন যত দিক থেকে যত বিপর্যয় আসুক না কেন জীবনের পরিবেশ লুপ্ত হবে না। পুরাতনের বিদায় হলেও নতুনের আগমন হবে। অতএব পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে একমাত্র সূর্যপ্রদত্ত তাপ ও আলোর উপর। কিন্তু সূর্য কী অমর ?

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, একদিন ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করে জন্ম নিয়েছিল সূর্য। কিন্তু জন্ম যার আছে মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। কেবল পার্থিব

জীব ও উদ্ভিদ নয়, বিশ্বের সবকিছুই মৃত্যুর অধীন। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, এমনকি বিশ্বজগতও একদিন না একদিন মৃত্যুকে বরণ করবে। ঐ যে নীল আকাশ তারও সঙ্কোচন ঘটে মৃত্যু হবে। অতএব সূর্য ও পৃথিবী তো ছার! তবে সূর্যের মৃত্যু ঘটলে পৃথিবীরও ঘটবে মৃত্যু। তাহলে কবে আসবে সেই দিনটি?

বিজ্ঞানীরা বলেন, সে ভাবনার এখন কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের হিসেব থেকে জানা গেছে, আজ থেকে পাঁচশ' কোটি বছরেরও পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে সূর্য। তবুও সে এখন বয়সে তরুণ। তার দেহে এখনও যে পরিমাণ হাই-ড্রোজেন আছে তাতে সে এই একই হারে তাপ বিতরণ করে চলবে আরও কম করে পাঁচশ' কোটি বছর। অর্থাৎ পাঁচশ' কোটি বছর পৃথিবী নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। কিন্তু তারপর?

আমরা জানি, সূর্যদেহে হাইড্রোজেন পারমাণবিক বিক্রিয়ায় অহরহ গঠন করে চলেছে হিলিয়াম। মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি টন হাইড্রোজেন বিযুক্ত হচ্ছে। তবুও আজ পর্যন্ত তা সূর্যের বিশাল হাইড্রোজেন ভাণ্ডার থেকে খরচ করেছে শতকরা মাত্র ১৮ থেকে ২০ ভাগ। যখন সৌর-হাইড্রোজেনের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, তখন অপেক্ষাকৃত ভারী মৌল-উপাদানগুলির মধ্যেকার পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হবে। অর্থাৎ সূর্যের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার কম হয়ে যতই হিলিয়ামের পরিমাণ বাড়তে থাকবে তত তার দেহে ধীরে ধীরে বার্ধক্য ভর করবে। ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্য আর এই হারে তেজ বিকিরণ করতে পারবে না। পূর্ণ বার্ধক্য এসে ভর করবে তখন।

সূর্যদেহে হিলিয়ামের পরিমাণ যখন বাড়বে ও অন্যান্য উপাদানের পার-মাণবিক বিক্রিয়া শুরু হবে তখন তার আয়তনও প্রসারিত হতে পারে, বৃদ্ধি পেতে পারে ঔজ্জ্বল্যতাও। হয়ত এমনও হতে পারে, তখন তার দেহখানা স্ফীত হতে হতে নিকটস্থ সব গ্রহগুলিকে বুকে টেনে নিতে পারে। অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলকে সে গ্রাস করে ফেলবে। সেই বৃহদাকার রক্তবর্ণ সূর্য পুড়ে ছারখার হতে হতে তারপর আবার সঙ্কুচিত হতে থাকবে আয়তনে, বর্তমান আয়তনের একশো ভাগের এক ভাগে পরিণত হয়ে সেই শ্বেতবর্ণ বামনাকার সূর্য অবশেষে নিভে যাবে সম্পূর্ণভাবে। তখন তার যে কয়েকটি গ্রহ অবশিষ্ট থাকবে সেইগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সূর্য মহাকাশের মহানিশার মধ্যে পূর্ববৎ পরিক্রমা করতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দুর্যোগ নামতে পারে অন্ততঃ পাঁচশ' কোটি বছর পরে এবং সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে নিভে যেতে লাগবে আরও এগারোশ'

কোটি বছর। তবে পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদজগৎ অত বছর টিকবে না। সূর্য-দেহে জরা দেখা দিলেই পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যাবে পরিবর্তন। সে পরিবর্তন থেকে রক্ষা পাবে না পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ। এককথায় এগারোশ' কোটি বছরের বহু পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যাবে জীব, উদ্ভিদ এবং আজকের পরিবেশও হবে লুপ্ত।

বিজ্ঞানের যে ভাবে উন্নতি হচ্ছে এবং মানুষের এই সভ্যতা যদি ততদিন টিকে থাকে তাহলে মানুষ বৃদ্ধ সূর্যকে ধ্বংস করে দিয়ে এক নতুন সূর্যেরও জন্মদান করতে পারে, এক সৌরজগত ছেড়ে অন্য সৌরজগতে পাড়ি দিতে পারে, মহাকাশে ভ্রমণ করতে করতে এমন দু চারটি গ্রহও পেতে পারে যেখানে মনুষ্য-বাসোপযোগী পরিবেশ আছে। অপরদিকে শুক্রগ্রহকে ধূলিমুক্ত করে পার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে কিংবা বৃহস্পতির মত বিরাট গ্রহের রূপও পরিবর্তন করে দিতে পারে। কিন্তু কোটি কোটি বছর ধরে কী টিকে থাকবে মানুষের এই সাধের সভ্যতা?

এইখানেই আছে যথেষ্ট সংশয়। পৃথিবী অবশ্যই তার বর্তমান পরিবেশকে হয়ত টিকিয়ে রাখবে আরও পাঁচশ' কোটি বছর। কিন্তু আমরা বা বর্তমানে জীবজন্তু ও গাছপালারা?

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে নেমে আসে হিম যুগ বা তুষার যুগ। এই যুগের স্থায়িত্বও কম করে বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর। সমগ্র পৃথিবীটাই সে সময় বরফে আবৃত হয়ে যায়। জীব, উদ্ভিদ সবকিছুই তলিয়ে যায় বরফের তলায়। তখন তার রূপটা হয় আজকের বৃহস্পতির মত বরফের রাজ্য। তবে অতি সামান্য জায়গায়, যেমন পার্বত্যগুহা প্রভৃতি উচ্চস্থানে কিছু কিছু জীব টিকে থাকলেও থাকতে পারে। সেই সঙ্গে পাহাড় অঞ্চলের কিছু কিছু উদ্ভিদও। হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বরফ গলে যায়। তখন পুনরায় চলতে থাকে সৃষ্টির কাজ—বংশ বিস্তার করে অতীত দিনের অবশিষ্ট প্রাণী ও উদ্ভিদ। আবার চলে ক্রমবিবর্তন। ক্রমবিবর্তনের ধারায় একদিন আবির্ভূত হয় উন্নত জীবগোষ্ঠী। যদি ক্রম-বিবর্তনের ধারায় উন্নত জীবগোষ্ঠী আসার আগে পুনরায় শুরু হয়ে যায় তুষার যুগ তাহলে তো কথাই নেই। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বরফ, অরণ্য আর অরণ্যের জীবকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে পৃথিবীকে। আগে হয়েছিলও তাই। আদিম পৃথিবী অশান্ত থাকার জন্য হিম যুগ আসতো ঘন ঘন। ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষ আসার আগে পুনরায় শুরু হয়ে যেতো তুষার যুগ। বর্তমানে তুষার যুগ

আসতে বিলম্ব হওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত আছে এই ক্রমবিবর্তন। তাই মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের আগমন সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিগত তুষার যুগ আরম্ভ হয়েছিল আজ থেকে লক্ষ বছর পূর্বে এবং শেষ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। অনেকের বিশ্বাস, লক্ষ বছব আগেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল মানুষের পূর্বপুরুষ। তখন সে মানুষের চেহারা এবং চালচলন আজকের মানুষের মত ছিল না। কথা বলতে জানতো না। হয়ত উলঙ্গ থাকতো। আগুন জ্বালাতেও জানতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তুষার যুগ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। দু-চারটে দল টিকে গিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে তাদের কাটাতে হয়েছিল গিরিগুহায়। তারপরে সেই গিরিগুহায়ই জন্ম নিয়েছে আজকের মানুষের পূর্বপুরুষ। যদি তুষার যুগ না আসতো তাহলে মনুষ্য-সভ্যতা আরও এগিয়ে যেত অনেকখানি। অন্যদিকে হয়ত মানুষের ভিড়ে পৃথিবীতে পা ফেলারও জায়গা থাকতো না।

এখন প্রশ্ন, হিম যুগ কী এবং কেন আসে পৃথিবীতে?

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এখনও অশান্ত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর উপরিভাগটার মাত্র ত্রিশ চল্লিশ মাইল গভীরতা পর্যন্ত গঠিত হয়েছে কঠিন শিলার স্তর। তার নিচেই আছে উত্তপ্ত পাথর ও গলিত ধাতুর স্তর। যেগুলো আবার সব সময় ফুটছে টগবগ করে। কোন কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে যদি বিরাট রকমের পরিবর্তন আসে তাহলে পৃথিবীর মেরুদেশেরও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে মাঝে মাঝে ঐ রকমই হয়। আজ যেখানে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আছে, সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং নিরক্ষবৃত্তের দুপাশে দুটি মেরুদেশ গজিয়ে উঠল। অপরদিকে বর্তমানের মেরু দুটি নিরক্ষবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। তখন নতুন মেরুকেই অবলম্বন করে ঘুরবে পৃথিবী। নতুন মেরুদেশে জমবে বরফ, আর পূর্বের মেরুদ্বয়ে যে বরফ জমা ছিল সেগুলি গলে গিয়ে সারা পৃথিবীকে করবে প্লাবিত।

দ্বিতীয় একটা কারণও অনুমান করেছেন বিজ্ঞানীরা। যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন জ্যোতিষ্কের দেহাবশেষ ধূলিকণার আকারে প্রবেশ করে তাহলে বায়ুমণ্ডলের সমূহ জলীয় বাষ্প ঐ ধূলিকণাকে অবলম্বন করে ঘনীভূত হবে এবং ঝরে পড়বে বৃষ্টির আকারে। জলে জলময় হবে পৃথিবী। সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্পশূন্য হয়ে পড়লে তাপধারণ ক্ষমতাও হারাবে। তারই পরিণাম হবে তুষার যুগ। তুষার যুগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও একমত হতে

পারেননি তবে তুষার যুগ যে আসে সে বিষয়ে সকলেই একমত। তাঁরা মনে করেন তুষার যুগের পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সময়ের তিনটি বৃত্ত কাজ করে। প্রথম বৃত্তটি অক্ষরেখার ঘূর্ণনের দরুণ ২৫,৮০০ বছর সময়কালের, দ্বিতীয়টি অক্ষরেখার নড়ন-জনিত ৪০,০০০ বছরের, তৃতীয়টি পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত, ৯০,০০০ থেকে ১০০,০০০ বছর সময়কালের।

তৃতীয় আর যে কারণে পৃথিবীর ধ্বংস আসতে পারে তা এই আকাশে বিচরণশীল এমন অনেক ধূমকেতু আছে—যাদের দেহখানা পৃথিবীর বিপরীত বস্তুকণা দ্বারা গঠিত। যদি এই জাতীয় ধূমকেতু কোনদিন পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী হয় কিংবা তার দেহাবশেষ পৃথিবীর আকর্ষণের আওতায় এসে পড়ে তাহলে পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে উৎপন্ন হবে ভয়ঙ্কর তেজ। এমন তেজ যে, শত শত হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতাকেও হার মানাবে। তখন পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে পারবে না।

আজকের দিনে আরও একটা সন্দেহ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পৃথিবীর তাবৎ শান্তিকামী ও চিন্তাশীল মানুষ সন্দেহ পোষণ করছেন, উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করেও স্বার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভস্মাসুরের মত নিজের ধ্বংস নিজেই না ডেকে আনে! ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সে মেতে উঠেছে এবং তৈরি করে চলেছে মারণাস্ত্রের পর মারণাস্ত্র। তাদের ভাণ্ডারে যে সব বোমা জমে উঠেছে সেগুলির দু-একটি প্রয়োগ করলেই পৃথিবীটা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে। তবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম।

কারণ যাই হোক না কেন, পৃথিবীর বুকে ব্যাপক ধ্বংস পূর্বে যখন বার বার এসেছে তখন ভবিষ্যতে অবশ্যই আসবে। হয়ত পৃথিবী পুরাতনকে দীর্ঘকাল আঁকড়ে রাখতে চায় না। জীর্ণ বস্ত্রের মত পুরাতন ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে নতুনকে বরণ করতে চায়। তাই আজকের এই সভ্যতা, এমনকি বর্তমান পৃথিবীর সমূহ জীবজন্তু, উদ্ভিদ সবই একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পুরাতনকে ভিত্তি করে পুনরায় শুরু হবে নতুন সভ্যতার ইমারত। তাহলে কবে আসবে সেই দুর্যোগ?

এদিক থেকেও বিজ্ঞানীরা আশার কথা শুনিয়েছেন। কয়েক হাজার বছরের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর দুর্যোগ পৃথিবীর বুকে নামার কোন সম্ভাবনা নেই। ততদিনে বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হবে। হয়ত গ্রহান্তরে মনুষ্যবাসোপযোগী পরিবেশও গড়ে তুলবে। অমরত্ব অবশ্যই লাভ করতে পারবে না তবে জীবনকালকে করবে বর্ধিত। এমনকি গবেষণাগারে জীবকোষ তথা একটি পূর্ণাঙ্গ মানব-শিশুকেও জন্মদান করতে সমর্থ হবে হয়ত।